বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত তথ্যের মূল্যায়ন

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০২

M.Phil

RB
B
954.92
NAB
c-2

নূর নাসরীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত তথ্যের মূল্যায়ন

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০২

Dhaka University Library
400842

400842

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

নূরে নাসরীন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত তথ্যের মূল্যায়ন

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০২

400842

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ কে, এম, মোহসীন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক
নূরে নাসরীন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	
প্রথম অধ্যায় :	১
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি	
দ্বিতীয় অধ্যায় :	
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন	
ক. অস্ত্র	২৬
খ. আলোকচিত্রে মুক্তিযুদ্ধ	৩৩
গ. পীড়ন যন্ত্র	৪৮
ঘ. আত্মসর্ম্পনের টেবিল	৫১
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের পতাকা	৫২
চ. স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের নিদর্শন	৫৫
ছ. মাথার খুলি	৬১
জ. শহীদ মিনারের ভগ্নাংশ	৬৫
তৃতীয় অধ্যায় :	
জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত লিখিত নিদর্শন	
ক. পোষ্টার	৬৭
খ. ব্যাজ	৮৩
গ. স্টীকার্স	৮৯
ঘ. ডাক টিকেট (সংগ্রহে নাই)	৯৪
ঙ. ওডারল্যান্ড এর নিদর্শন	৯৬
চতুর্থ অধ্যায় :	
বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিল	১০২
পঞ্চম অধ্যায় :	
ক. উপসংহার	১২০
খ. পরিশিষ্ট ও গ্রন্থ তালিকা	

400842

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কোন দেশ ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সে দেশ বা সমাজের অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সেই অতীত ইতিহাসের ধারক ও বাহক হলো সেদেশের জাতীয় জাদুঘর। তেমনিভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে দেশের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতিতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিসহ সমকালীন শিল্পকলা বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মারক। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আনুমানিক ২৬০০ (ছাব্বিশ) শত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নিদর্শন রয়েছে। তারমধ্যে প্রায় ১০০ একশত নিদর্শন জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারীতে প্রদর্শিত রয়েছে। যেমন- আলোকচিত্র, ব্যাজ, লিফলেট, স্টীকার্স, পোষ্টার, অস্ত্রশস্ত্র, পতাকা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিদর্শন, উপজাতীদের হাতে তৈরী অস্ত্র, গোপন ম্যাপ,মানুষের মাথারখুলিসহ আরো অন্যান্য নিদর্শনাদি।

বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকেই তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ শুরু হয় এবং তা আজঅবধি অব্যাহত রয়েছে। জাদুঘরের অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহের মতন মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহ ও একটি চলমান প্রক্রিয়া। জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন প্রদর্শনীর জন্য দুটি স্থায়ী গ্যালারীর পাশাপাশি জাদুঘরের অন্যান্য গ্যালারীতেও মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ও পেন্টিং প্রদর্শিত হচ্ছে। শহীদ বুদ্ধিজীবিদের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনাদি দিয়ে সাজানো একটা স্বতন্ত্র গ্যালারী রয়েছে জাদুঘরের তৃতীয় তলায় মেজানিন ফ্লোরে। ১৯৯২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এই গ্যালারীটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিযুদ্ধের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্প। তাছাড়াও বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান যেমন অস্ত্র, দলিল/ ডকুমেন্টসহ নানা উপাদান ও স্মারক জাতীয় জাদুঘর প্রতিনিয়ত সংগ্রহ করছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের দলিলসমূহ জাদুঘর লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের চারটি কিউরোটোরিয়াল বিভাগের মধ্যে, ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগে অন্যান্য নিদর্শনাদির সাথে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনগুলো অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। অত্রবিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ বিভাগীয় বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করলেও বিষয় ভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শনগুলো সতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট গবেষকবৃন্দ দেখাশুনা করেন। যেমন অত্র বিভাগীয় কর্মকর্তা যিনি মুদ্রা বা টেরাকোটায় বিশেষজ্ঞ, তিনি বিভাগীয় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি মুদ্রা বা টেরাকোটার বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তেমনি ভাবে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনের তথ্যভিত্তিক গবেষণার কাজ করার তাগিদ অনুভব করি।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ভূমিকার সাথে পরিচিত করতে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে হাজার হাজার বছর ধরে রাখতে এবং মানুষের গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে জাতীয় জাদুঘরের এ প্রয়াস। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজের অতীত ইতিহাস গর্বের সাথে স্মরণ করতে পরে। ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে ৯ মাস পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন সহ মুক্তিবাহিনী এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও সেই সাথে যুদ্ধের স্মারক নিদর্শন সম্পর্কে যথাসম্ভব বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। গবেষণা করতে গিয়ে জানা-অজানা অনেক বিষয়ই আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমি আমা: অভিসন্দর্ভে বহুমাত্রিক বিষয়ের তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আমার অভিসন্দর্ভের বিষয় বস্তু নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন।

ক) অস্ত্রশস্ত্র

খ) আলোকচিত্র

গ) পীড়ন যন্ত্র

ঘ) আত্মসমর্পনের টেবিল

ঙ) পতাকা

চ) ক্রীড়া সমিতি নিদর্শন

ছ) মাথার খুলি

জ) শহীদ মিনারের ভগ্নাংশ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত লিখিত নিদর্শন

ক) পোষ্টার

খ) ব্যাজ

গ) লিফলেট

ঘ) স্ট্যাম্প (সংগ্রহে নাই)

ঙ) ওডারল্যান্ড এর নিদর্শন

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিল

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায় : গ্রন্থ তালিকা ও পরিশিষ্ট

এই অভিসন্দর্ভটি লেখা ও গবেষণা কর্মের জন্য আমি সবচেয়ে বেশী ঋণী আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর কে.এম মহসীনের কাছে। আমার এম.ফিল ভর্তি থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ শেষ করা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তার মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি আমার কাজটি শেষ করতে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. ইফতিখার-উল-আউয়ালকে। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানকে। তিনি আমাকে এম ফিল এ ভর্তি সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন।

জাতীয় আর্কাইভ এর পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ ও জাতীয় আর্কাইভস থেকে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানসহ লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাদুঘরের প্রাক্তন কর্মকর্তা ড. ফিরোজ মাহমুদ কে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরার্মশ দিয়ে সহায়তা করেছেন।আমি বিশেষভাবে ঋণী জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগম-এর কাছে। তিনি আমাকে এম ফিল ভর্তি ও উচ্চতর

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার সহপাঠি বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন বিভিন্ন সময় আমার লেখার ব্যাপারে তথ্য, পরামর্শ ও বই পুস্তক দিয়ে আমাকে সহযোগিতা প্রদান করেন। তাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আমার সকল স্তরের সহকর্মীবৃন্দকে। বিশেষ করে আমার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং জাদুঘরের লাইব্রেরী শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দকে। এদের মধ্যে যাদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন তারা হলেন আনোয়ারুল হক, ড. আফরোজ আকমাম, ড. মোঃ রেজাউল করিম, জাহাঙ্গীর হোসেন, ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস, আনজালুর রহমান, কঙ্কন কান্তি বড়ুয়া, সাইফুজ্জামান, মোঃ শরিফুল ইসলাম ও মিজানুর রহমানকে।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও কলম্বিয়া প্রকাশনীর কর্ণধার লে: কর্ণেল (অব) নূরন্নবী খান (বীর বিক্রম) ও ঢাকাস্থ বিজয় কেতন জাদুঘরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর সারোয়ার হোসেন (পিএসসি) বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ, বই পুস্তক ও তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই অভিসন্দর্ভ শেষ করার ব্যাপারে আমি আরো যাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তারা হলেন- আমার মা মিসেস মনোয়ারা বিশ্বাস, পিতা জনাব মশাররফ হোসেন বিশ্বাস, এবং শাশুড়ী মিসেস রিজিয়া বেগম চৌধুরী।

আমার স্বামী চৌধুরী মোহাম্মদ তারেক রেজা এ গবেষণার কাজ শেষ করার ব্যাপারে আমাকে সবসময় সহযোগিতা এবং বই পুস্তক ও তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন।

আমার আত্মজ আবরার আলভী চৌধুরী ও আশনান নাভীদ চৌধুরী কোন সময়ই আমার গবেষণা কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং সহযোগিতা করেছে।

নূরে নাসরীন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭১ সালে নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। বাঙালীর এ বিজয় ছিল অন্যায়, অসত্য অত্যাচার অবিচার, অবহেলা, লাঞ্চনা ও শোষনের বিরুদ্ধে এক নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর বিজয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। এ স্বাধীনতা লাভের পেছনে ছিল অর্থনৈতিক শোষনের, সামাজিক বৈষম্যের ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দীর্ঘদিনের পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের এক করুন ইতিহাস। এরই ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগন একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ২৩ বৎসরের দীর্ঘ দুঃশাসনের অবসান ঘটে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে।

Joseph, R. Strayer জাতি গঠনের শর্ত সম্মন্ধে বলেছেন" those which correspond closely to old political units, those where the experience of living together for many generation within a continuing political framework has given the people some sense of identity, those where the political units conscide roughly with a distinct cultural area, and those where are indigenous institutions and habits of political thinking that can be connected to forms borrowed from outside." [1]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাচীন কাল থেকে বাঙ্গালী স্বাধীনসত্ত্বা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে আসছে। ২০০ বৎসরের ইংরেজ শাসন আমলে ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে তিতুমির,ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, সূর্যসেনের মত বাংলার গর্বিত সন্তানরা। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বাংলাদেশের একক স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করার অনুভূতি ঐতিহাসিক ভাবে বাঙ্গালী জাতির এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই অনুভূতির প্রেরণাতেই পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতি এক গৌরবময় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

---

[1] Rounak Jahan, Pakistan, failure in National integration,p.9

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গের জনগনের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রথম থেকে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলো। ক্রমে এই আন্দোলন বৃটিশ এর বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে রূপ নেয়। পাকিস্তান সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিলো পূর্ব বঙ্গের জনগন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কেননা উপমহাদেশের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রধিকার প্রতিষ্ঠা ,স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাংলার জনদরদী নেতা শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে। এই অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাব ছিল-

"Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, vis, that geographically contiguous units are demarcated into region which should be so, constituted which such territorial readjustments as may be necessary that the areas in, which the Muslims are numerically in a majority as in the north western and eastern zones of India should be grouped to Constitute 'Independent states' in which the constituent Units shall be autonomous and sovereign "[2]

এদিকে ১৯৪৬ সালের গণভোটে পূর্ববাংলা জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত রায় দেয় পাকিস্তানের পক্ষে। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন তা পাকিস্তানের ছিলনা। উপরোন্তু দেখা যায় যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর কখনও সেখানে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দেখা যায় গনতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর পাকিস্তান সরকারের বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টিতে প্রধান

---

[2] A.M.A Muhith, Bangladesh; Emergence of a nation p. 29-30

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রেখেছিল পূর্ব বাংলার জনগণ। অথচ পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের দখলে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে প্রায় সব ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। পূর্ববাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলনকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা ইসলাম বিরোধী ও পাকিস্তান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তা স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ নিজেদের সার্বিক মুক্তির আশায় পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো। পাকিস্তা-নী নেতৃবৃন্দ পূর্ববাংলার জনগনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। ১৯৪৬ সালে দিল্লী প্রস্তাব ভিত্তিক যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল, সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ হাজার হাজার বাঙালী মুসলমান ছাত্র জনতার ত্যাগের বিনিময়ে গড়া পাকিস্তানকে সবাই একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিল।

যদিও পাকিস্তান সৃষ্টির পরই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে সংমিশ্রন করলে বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তিনি হিন্দু, খ্রীশ্চিয়ান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বাস দিয়েছিলেন তারা পাকিস্তানের মুসলিম নাগরিকের মত সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করবে। তিনি স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় ঘোষনা দেন,

পাকিস্তানে একটি আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে। তিনি বলেন "we will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of every individual but in the Political sense as citizen of the state"[3]

দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে জিন্নাহ তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, হিন্দু মুসলমান বড় কথা নয়। প্রত্যেকের ধর্ম তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে আমরা একই রাষ্ট্রের নাগরিক। সেই সময় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর এই বক্তব্য সর্বমহলে

---

[3] Mufizulla Kabir, Experience of an Exile at Home p.2.

Dhaka University Institutional Repository

প্রসংশিত হয়েছিলো। কিন্তু দেশ বিভাগের অল্পকাল পরই জিন্নাহ কয়েকটি মৌলিক ভুল করেন। বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা না করে তিনি একতরফা ভাবে উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেন। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৪৮ সালে কনভোকেশনে জিন্নাহর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ পূর্ব বাংলার মানুষের দাবী দাওয়াকে কোন গুরুত্ব দেয় নাই। ১৯৫৬ সালে পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হলো পূর্বপাকিস্তান। কারণ দেখানো হলো যে, বাংলা বলতে ভারতের প্রদেশ বুঝাতে পারে। পাকিস্তান সরকার মনে করেন বাংলা শব্দটি হিন্দু উদ্ভূত, যা পাকিস্তান এবং ইসলাম বিরোধী হিসাবে বিবেচনা করা হতো। আরও বলা হলো যে, বাংলার মুসলমানগণ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এমনকি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছিলেন, " If I may point out, you are all outsiders, Who were the original inhabitants of Bengal- not those Who are now living, So what is the Use saying we are Bengalis or Sindhis or Pathans or Punjabi "[৪]

যখনই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হতো বা অধিকার আদায়ের আন্দোলন করা হতো, তখনই এটিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ইসলাম বিরোধী এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করতো। এতেই বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র ফুটে ওঠে।

বাঙ্গালীদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান তার *Friends not masters* গ্রন্থে বলেন " The people of Pakistan consist of a variety of races, each with its own historical background and culture East Bengalis, who constitute the bulk of the population, probably belong to the very Original Indian races, It would be no exaggeration to say that upto the creation of Pakistan, they had not known any real freedom or sovereignty. They have been in turn ruled either by the caste Hindu, Moghals, Pathans or the British in addition, they have been and still are Under conciderable Hindu Cultural and linguistic influence. As such they have all the inhibitions of

[৪] ঐ, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

downtrodden races and have not yet found it Possible to adjust psychologically to the requirement of the newborn freedom. Their popular complexes exclusiveness, suspicion and a short of defensive aggressiveness probably emerge from this historical background"[৫].

পাকিস্তানভূক্ত পাঞ্জাব নিয়ে, পাকিস্তান নেতৃবৃন্দের কোন ভয় ছিলনা কিন্তু পূর্ববঙ্গ যেকোন সময় ভারত দখল করতে পারে এই গুজব ছড়ানো হয়েছিলো। ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে ২১ শে মার্চের জনসভায় জিন্নাহ বক্তৃতায় এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন "Quite Frankly and openly I must tell you that you have got amongest you a few communists and other agents financed by foreign help and if you are not careful, you will be disrupted. The idea that east Bengal should be brought back into the Indian union is not given up and it is their aim yet[6].

বাঙালীদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রথম চক্রান্ত ছিল ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা। প্রায় প্রথম থেকেই অপপ্রচার চালানো হতো যে, বাঙালীগন হিন্দু এবং তাদের ভাষাও হিন্দুদের ভাষা। সুতরাং বাংলা কখনও মুসলমানদের ভাষা হতে পারে না। অথচ পাকিস্তানের ৫৫% লোক বাংলায় কথা বলতো। যদি পাঞ্জাবী ভাষা হিন্দু, মুসলমান উভয় জাতির ভাষা হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে, তবে বাংলা হতে পারবে না কেন? এমনকি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষাও ছিল গুজরাটী। তিনি নিজেও উর্দূ জানতেন না, ইংরেজীতে কথা বলতেন। উর্দূ পাকিস্তানিদের ভাষা ছিলনা। উর্দূ ছিল উদ্বাস্তুদের ভাষা। রেসকোর্সের জনসভায় জিন্নাহ বলেছিলেন যে "আমি আপনাদের স্পষ্ট করে বলছি যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দূ, অন্যকোন ভাষা নয়। এ থেকে যদি কেউ আপনাদের বিপথগামী করে, তবে বুঝতে হবে তারা পাকিস্তানের শত্রু। কারণ রাষ্ট্র ভাষা ছাড়া কোন জাতির মধ্যে সংহতি থাকেনা। অন্যান্য জাতির ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেই সেটা বোঝা যায় । কার্জন হলের কনভোকেশনে ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ঘোষণা দিলেন Urdu would be the State

---

[৫] ঐ, পৃ. ৪
[৬] ঐ পৃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

Language of Pakistan - তখনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্ররা No No বলে প্রতিবাদ জানায়।

জিন্নাহর এই বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে বাংলার জনসাধারণ। রাষ্ট্রীয় সংহতির নামে উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। উর্দূকে শ্রেষ্ঠ ভাষা প্রমাণ করার পক্ষে ১৯৫১ সালে ১৫ এপ্রিল করাচীতে পাকিস্তান উর্দূ কনফারেন্সে তৎকালীন পাক সরকারের মদদপুষ্ট বাঙালী শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পাক ভারত উপমহাদেশের সকল মানুষকে উর্দূভাষা এক গ্রন্থিতে সংযুক্ত করেছে। উর্দূ উপমহাদেশের মুসলিম তমুদ্দুন ও তাহজিবের ভান্ডার। তিনি আরো বলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসে করাচীতে এক কনফরেন্সে উর্দূকে জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অনুমোদন করেন।

আরো লক্ষ্য করা যায় যে, অবাঙালী সরকারী কর্মকর্তা বৃন্দ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী উকিল ডাক্তার সকল পেশার মানুষ বাঙালীদের কে উর্দূতে কথা শেখানোর প্রচেষ্টা শুরু করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা কখনও বাংলা শেখে নাই বা শেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। অথচ হাজার মাইলের ব্যবধানে পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া কোন মিলই ছিলনা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদের ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে ইংরেজী ও উর্দূর পাশাপাশি বাংলা ভাষার সমান মর্যাদা দেবার দাবী তুলেছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সমগ্র পাকিস্তানের ৫৫% লোকের ভাষাছিল বাংলা। বাঙালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম বৈষম্য মূলক আচরন ফুটে উঠে। জিন্নাহ তাঁর একটি বক্তব্যে বলেছিলেন, একক ভাষা ছাড়া কোন জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি থাকেনা। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একক ভাষার প্রয়োজন তা হলো উর্দূ। যে উর্দূর বিপক্ষে কথা বলবে সে, পাকিস্তানের শত্রু হিসাবে গন্য হবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জনগনের ভাষাগত অবস্থান ছিল নিম্মরূপঃ

ভাষা	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
পশতু	৩৫,৮৯,৬২৬	৭.১
বেলুচী	১০,৭৫,৯৯৯	১.৪
সিন্ধী	৪৩,৫৯,২৮৭	৫.৮

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাবী	২,১৪,৬৬,৮১৫	২৮.৪
ইংরেজী	১৩,৭৭,৫৬৭	১.৮
উর্দূ	৫৪,১৯,১৩১	৭.২
বাংলা	৪,১২,৯১,৮৮৯	৫৪.৬

[৭]

ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং পরিকল্পিত ভাবেই অবাঙালী উর্দূভাষি সরকারী কর্মকর্তাদের, পূর্ব বাংলায় বদলী করা হতো। এরা বাঙ্গালীদের অবজ্ঞার চোখ দেখতো এমনকি এদের সাথে উর্দূ কথা না বললে এরা ক্ষুদ্ধ হতো। বাংলাভাষার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য ষড়যন্ত্র ছিল আরবী হরফে বাংলা লেখা চালু করার চেষ্টা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানের অধীনে আরবী হরফে বাংলা লেখা চালু করার প্রকল্প গ্রহন করা হয়।

ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংলার ভাষা হিসাবে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার দাবী জোরদার হয়েউঠে। ফলে বাংলাভাষাকে আরবী হরফে লেখার যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। এটি যে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের হীনচক্রান্ত তা বুঝতে পূর্ব বাংলার মানুষের বেশীদিন সময় লাগেনি। তাদের এই চক্রান্তে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেনী ও শিক্ষিত সমাজ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। বাংলা ভাষার দাবীকে পাশকাটিয়ে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তন, রোমান হরফে বাংলা লেখার পাশাপাশি আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে অবশ্য অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন।

এদিকে ১৯৫২ সালে ২৬ শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীরূপে ঢাকায় আসেন এবং ২৭ শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় পুনরায় ঘোষনাদেন, একমাত্র উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি আরো বলেন যে, কোন রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকতে পারেনা এবং এতে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় না। নাজিমুদ্দিনের এই ঘোষনার প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র সমাজ বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। ৩০ শে জানুয়ারী ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকা হয়। এই ভাবে আন্দোলন ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠার পটভূমিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৩১ শে জানুয়ারী (১৯৫২) ঢাকা বার হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হয় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

৭। প্রফেসর সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১ পৃ-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সকল দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এতে অংশ গ্রহন করেন। এই ভাবে সকল দল ও সংগঠনের অংশ গ্রহনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় ভিত্তিক সর্বদলীয় এই কর্মপরিষদ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

৩০ শে জানুয়ারীর ছাত্র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫২এ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে ২১ শে ফেব্রুয়ারী সাধারন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকার ২০ শে ফেব্রুয়ারী থেকে একমাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে এবং সকল সমাবেশ মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নিষেধ অমান্য করে মিছিল করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে সালাম, শফিক, রফিক, জব্বার বরকত শহীদ হন। এর ফলশ্রুতিতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে পাকিস্তান সরকার কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহন করে। পরিশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙালীদের শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের অন্যতম ক্ষোভের কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। পাকিস্তানী স্বৈরশাসক সব সময় বৈষম্যকে সমর্থন জোগাত। প্রেসিডেন্ট, গভর্নর জেনারেল সামরিক ও অসামরিক রাষ্ট্রীয় পদ গুলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের দখলে ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক দিয়েও পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে বঞ্চিত করা হতো। বেশীর ভাগ ভূমি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল পাঞ্জাবী ও হিন্দু উদ্বাস্তু নেতৃবর্গ। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা পূর্ববংগর সম্পদ শোষন শুরু হয়। বস্তুতঃপক্ষে পাকিস্তানের দুই অংশের দুটি অর্থনীতি বিরাজমান ছিল। দেশের পশ্চিমাংশে উন্নতির মান ছিল পূর্ববংগের তুলনায় অনেক উপরে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমাংশের একটা প্রায় উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি করাই ছিল পাক শাসক গোষ্টির প্রধান লক্ষ্য। ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৬-৭০ এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় লক্ষনীয় ভাবে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির এ দ্রুততর বিকাশের হার পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির তুলনায় উচ্চহারে বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বৈচিত্র আনয়নের ফল।

১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোৎপাদন ৩২ কোটি থেকে ৬৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়। এই বৈষম্য থেকে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান কত দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের বৈষম্যঃ

সন	পূর্ব পাকিস্তানে	পশ্চিম পাকিস্তানে	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

[৮]

পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতি অধিকতর দ্রুত উন্নতি, ও বহুমুখীকরণ অনিবার্যভাবে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাউল ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গম এর মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করলেই এ বৈষম্য স্পষ্টতর হয়ে উঠে। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন একটন চাউলের দাম ছিল ৫১৮ টাকা, পশ্চিমপাকিস্তানে তার দামছিল ৩৩৪ টাকা। এ সময় একটন গমের দাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৫১৭ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে -২৬৭ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে একমন চাউলের দাম ছিল ৪২ টাকা ৩৭ পয়সা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গমের দাম ছিল ২২ টাকা।

৮। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড পৃঃ ৬১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরে আমদানী খাতে উভয় অংশের জন্য বরাদ্দের একটা সারনী নীচে দেওয়া হলোঃ

অর্থ বছর	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	৪০ মিলিয়ন টাকা	৩১৮মিলিয়ন টাকা
১৯৪৮-৪৯	২৮২	১১৭৭
১৯৪৯-৫০	৩৮৫	৯১২
১৯৫০-৫১	৪৫৩	১১৬৭
১৯৫১-৫২	৭৬৩	১৪৭৪
১৯৫২-৫৩	৩৬৬	১০১৭
১৯৫৩-৫৪	২৯৪	৮২৪
১৯৫৪-৫৫	৩২০	৭৮৩
১৯৫৫-৫৬	৩৬১	৯৬৪
১৯৫৬-৫৭	৮১৮	১৫১৬
১৯৫৭-৫৮	৭৩৫	১৩১৪ [৯]

পাকিস্তানের প্রথম দশ বৎসরে রফতানী খাত আয়ের একটা তুলনামূলক চিত্রঃ

অর্থ বৎসর	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	২৭২ মিলিয়ন টাকা	৪৪৪মিলিয়ন টাকা
১৯৪৮-৪৯	১৩২৮	৫৪২
১৯৪৯-৫০	৬৮৩	৫৩৫
১৯৫০-৫১	১২১১	১৩৪২
১৯৫১-৫২	১০৮৭	৯২২
১৯৫২-৫৩	৬৪২	৮৬৭

৯। প্রফেসর সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, ঐ পৃ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩-৫৪	৬৪৫	৬৪১
১৯৫৪-৫৫	৭৩২	৪৯৯
১৯৫৫-৫৬	১০৪১	৭৪২
১৯৫৬-৫৭	৯০৯	৬৯৮
১৯৫৭-৫৮	৯৮৮	৪৩৪ [১০]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের রফতানী আয়ের সিংহ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং এই পাট পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হতো।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাৎসরিক মোট উৎপাদন ও গড় পড়তা মাথা পিছু আয়ের হিসাব থেকে ও দু প্রদেশের অসম অর্থনীতির চিত্র পাওয়া যায়। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে এ চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

প্রথম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গড় পড়তা বাৎসরিক মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.৭৮% ও ৩.১৮% । এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় পাকিস্তানে বাৎসরিক গড় পড়তা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিলো ০.৬৯% আর পূর্ব পাকিস্তানে তা ০.৫৮ কমে গিয়েছিলো।

দ্বিতীয়-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্ব পাকিস্তানে বাৎসরিক মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ০.৭৮% এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৬.২% । বাৎসরিক গড় পড়তা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে ২৭৮ রুপি থেকে ৩১৮ রুপি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৬৬ রুপি থেকে ৪১১ রুপি।

তৃতীয়-পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে বাৎসরিক মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে ২২% ও ৩৫%। ১৯৬৪/৬৫ সন থেকে ১৯৬৯/৭০ সন পর্যন্ত বাৎসরিক গড় পড়তা মাথাপিছু আয়ের গতি প্রকৃতি ছিল নিন্মরূপঃ

১০। ঐ পৃ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

	১৯৬৪/৬৫	১৯৬৫/৬৬	১৯৬৬/৬৭	১৯৬৭/৬৮	১৯৬৮/৬৯	১৯৬৯/৭০
পূর্ব পাকিস্তান	২৮২	২৮৩	২৭৮	২৭৩	২৯২	২৯৯
পশ্চিম পাকিস্তান	৪১২	৪১৩	৪৩৩	৪৫২	৪৬৯	৪৮৩
বৈষম্য শতকরা	৩১.৫	৩১.৪৭	৩৫.৭৯	৩৯.৬০	৩৭.৭৪	৩৮.০৯৫

১১

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাৎসরিক মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিবর্তনের হারের সঠিক চিত্র নিম্মে দেওয়া হলো।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
	১৯৪৯-১৯৫০	১৯৫৯-১৯৬০	১৯৬৯-১৯৭০	১৯৪৯-১৯৫০	১৯৫৯-১৯৬০	১৯৬৯-১৯৭০
কৃষি	৬৫.২৫	৬০.৪০	৫৫.০০	৫৪.৫৯	৪৬.৮০	৪১.০০
শিল্প	৩.৮০	৬.০৮	৮.৫	৭.৯৪	১২.২৬	১৬.০০
গৃহ নির্মাণ	০.৪৮	১.৪৭	৬.০০	১.৪৯	২.৬০	৫.০০
যোগাযোগ	৫.০৯	৬.০২	৬.০০	৪.৯৬	৫.৫৯	৭.০০
ব্যবসা	১১.১৬	১০.৪৩	১১.০০	১২.২৪	১২.৭৫	১৪.০০
অন্যান্য	১৪.২২	১৫.৬০	১৩.৫	১৮.৭৮	২০.০০	১৭.০০

১২

১৯৬৬ সালে তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারীদের হার ছিল নিম্মরূপঃ

	বাঙালী	পশ্চিম পাকিস্তানী
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীয়েট	১৯%	৮১%
দেশরক্ষা	৮.১%	৯২.৯%
শিল্প	২৫.৭%	৭৪.৩%

১১। মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয়: আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, পৃঃ ৪১।

১২। ঐ, পৃ- ৪২

Dhaka University Institutional Repository

স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
শিক্ষা	২৭.৩%	৭২.৭%
তথ্য	২০.১%	৭৯.৯%
স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
কৃষি	২১%	৭৯%
আইন	৩৫%	৬৫%

[১৩]

পাকিস্তানের দুটি অংশের গুরুত্বপূর্ন পদগুলোতে যে বৈষম্য ছিল তা নিম্মে দেওয়া হলোঃ

সেনাবাহিনী	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
	৫০০০০০	২০.০০০অর্থাৎ৪%
নৌবাহিনী(টেকনিক্যাল)	৮১%	১৯%
নৌবাহিনী(ননটেকনিক্যাল)	৯১%	৯%
বিমান বাহিনী(পাইলট)	৮৯%	১১%
" (টেকনিশিয়ান)	৮৩%	১৭%
পাকিস্তান এয়ার লাইফ	৭০০০	২৮০
পি, আই, এ (পরিচালক)	৯	১
" এরিয়া ম্যানেজার	৫	০
পি, আই, এ বিমানবালা	৯৯	৪
রেলওয়ে বোর্ড ডিরেক্টরস	৭	১
রেডিও পাকিস্তান ডিরেক্টরস	১৯	১
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী	৮৪%	১৬% [১৪]

১৯৬০-৬৫ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রনয়নকালে আঞ্চলিক বরাদ্দ ও তার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নাদি কিছুটা গভীর ভাবে আলোচিত হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ রেহমান সোবহান, আখলাকুর রহমানও ডঃ মোশারফ হোসেনকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান স্থিরকরণ বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রন

Dhaka University Institutional Repository

জানানো হয়। ওয়াকিং গ্রুপের আলোচনায় অর্থনীতিবিদগন পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করেন। তারা আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সম্পদের বন্টনে জনসংখ্যার আকারের সাথে সম্পর্কিত করার গুরুত্বের কথা এবং ১৯৫০ এর দশকে সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে অসমতা ঘটেছে তা সংশোধনের কথা বলেন। এসব আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবায়নের দ্বিধাবিভক্তি এবং কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশের পর দেখা গেল, পরিকল্পনা ব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন মোটেও এই যুক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয়নি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দুই প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্য গুলো আলোচনা করা হলো। অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজ জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের জীবন যাত্রার মান অনেক বেশী উপরে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায়। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে দুটি শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিলো। কিন্তু এর একটিও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলনা। কারণ এতে তাদের স্বার্থের কোন প্রতিফলন ঘটেনি।

অর্থনৈতিক বৈষম্যে সম্পর্কে H, Papanek বলেন "The issue of economic disparity between east and west Pakistan is deeply bound up with the problem of an imbalance in political power. The absence of Bengal is particularly notable at the lop. Among the 29 largest houses of families there are two Bengalis mean the bottom of the lest . In a slide carried out in 1956-60, it was revealed that the Bengali Muslims owned and controlled only 2.5 percent, Bengali Hindus 8.5 and Markers, other Hindus and Sikhs another 3.5 percent. By contrast, nearly half of all industrial assets were weed or controlled by menders of nosiness communities of west Pakistan or west Indian origin"[15]

বস্তুতঃ পক্ষে বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় পাকিস্তানের জন্মের পরপরই। ষাটের দশকের শেষের দিকে বাঙালীরা পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর হঠকারিতা বুঝতে পারে।

১৩। ঐ পৃ- ৫৭,

১৪। ঐ পৃ- ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তাই তারা অন্যায়, অসত্য অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রূখে দাড়ায় এবং আন্দোলন শুরু করে। পাকিস্তানী শাসক ও শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সকলস্তরের জনগন সক্রিয় হয়ে উঠে। গণআন্দোলনগুলো ক্রমশই অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং ক্রমে তা স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়। গণতন্ত্রের প্রতি পাকিস্তানী শাসকবৃন্দের অনীহা বাঙালীদের অসন্তোষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী ছিল। কারণ তারা মন্ত্রিত্ব লাভের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের সমর্থন করতো। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে কখনও সাধারন নির্বাচনের পরামর্শ দিতো না । ১৯৫৪ সালের পর শুধুমাত্র ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ২৩ বছর শাসনামলে মাত্র একবার নির্বাচন হয়েছিল, কিন্তু কখনও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ করতে দেয়া হয়নি। এ বিষয়টি ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার একটি বড় কারণ।

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের অ-জনপ্রিয়তার কারণে ১৯৪৯ সালে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী গঠিন হয়েছিল। পাকিস্তানী স্বৈরশাসকগণ কখনও বিরোধীদলকে সহ্য করতে পারতো না। বিরোধী দলের উপর সবসময় দমন নির্যাতন চালানো হতো। ময়মনসিংহে আওয়ামীলীগের একটা মিটিংকে পন্ড করে দেওয়ার জন্যে নুরুল আমিন, মোনায়েম খানও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কিভাবে বিরূপ ভূমিকা রেখেছিল, সে বিষয়টি আবুল মনসুর আহ্‌মদ তার রাজনৈতিক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বিরোধী দলের প্রতি এমন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তানের গনতন্ত্রের বিকাশের অন্তরায় ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম লীগের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়। এদিকে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা জনগনের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের উপর পূর্ব বাংলার জনগনের মোহভঙ্গ হয়।

১৫। Rangalal Sen, Political elites in Bangladesh, p-2.

Dhaka University Institutional Repository

যে জনগন ১৯৪৬ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তারাই ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। মুসলিমলীগের বড়বড় নেতারা পরাজিত হন। এটা ছিল একটা ব্যালট বিপ্লব। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বিপুল সংখ্যা গোরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, ফলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

কিন্তু মাত্র কয়েক দিন পরেই কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিলেন। কারণ হিসেবে দেখানো হলো আদমজী জুট মিলে বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা। এছাড়াও আরও বলা হলো ফজলুল হক পাকিস্তানের শত্রু, তিনি বিশ্বাস ঘাতক, এবং কলকাতায় বসে স্বাধীন বাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র করেছে। ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়ার পর, যুক্তফ্রন্ট নেতাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালানো শুরু হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদকে গ্রেফতার করা হয়। সবধরনের মিছিল, মিটিং, সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ নেতারা গ্রেপ্তার হন। ফলে পাকিস্তানী শাসকগন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের আস্থা হারায়। পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের সাথে সমঝোতার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পাকিস্তানে আর সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং গনতন্ত্রের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৬ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের সংবিধান পাশ করা হয় এবং এতে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষনা করা হয়। এতে বলা হয় সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দুই অংশে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবে। পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো পূর্ব পাকিস্তান। ২১ দফা বাতিল করা হলো এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি সংবিধানে গ্রহণ করা হলো না। যা হোক ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যোগদান করলেন। তখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আভ্যন্তরীন দ্বন্ধের সম্মুখীন হন। স্বায়ত্বশাসন না দেওয়ার জন্যে সংবিধান ও মন্ত্রীসভার সমালোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে ক্ষমতায় যাওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকতর সহযোগিতার দাবী জোরদার চেষ্টা শুরু করেন যা গনতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করেছিল, ফলে অচিরেই সোহ্‌রাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। অতঃপর আই, আই, চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। কিন্তু এই মন্ত্রীসভা কেবল দু'মাস টিকেছিল, এরপর রিপাবলিকান পার্টির ফিরোজ খান নূন ক্ষমতায় এলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারে ও পরিবর্তন হলো। আতাউর রহমান খান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেন কারণ কে এস পি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফজলুল হককে গভর্ণর থেকে সরানো হলো এবং প্রেসিডেন্ট শাসন জারি করা হলো। আতাউর রহমান পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ডঃ খান সাহেব আততায়ীর হাতে নিহত হন। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকারকে বিরোধী দলের সদস্যগণ মারপিট করে, এতে হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৮ সালে ৭ ই অক্টোবর সামরিক আইন জারি করা হয়, সংবিধান বাতিল করা হয় এবং জেনারেল আইউব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। অল্পকাল পরেই আইউব খান প্রেসিডেন্সি বাতিল করে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডে স্থগিত করে দেন।

পরবর্তী ১০ বছর আইউব খান একক ক্ষমতা দ্বারা দেশ শাসন করেন। তিনি সামরিক শাসনের পাশাপাশি স্থায়ী আমলাতন্ত্র ও গড়ে তোলেন। যদিও এ সময়ে সামরিক ও বে-সামরিক শাসনে বাঙালীদের কোন অংশ গ্রহন ছিলনা। আইউব খান দেশের রাজনীতিবিদগনকে অযোগ্য বলে ঘোষনা করেন এবং রাজনীতিবিদগনের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহন করেন। তাদের উপর জেল, জুলুম ও নিপীড়ন চলতে থাকে। আবুল মনসুর আহমদের মতে, সেইসব রাজনীতিবিদগনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়, যারা ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলো; অথচ মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদগনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলোনা। এ সময় মওলানা ভাসানী, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল খালিক, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কুরবান

Dhaka University Institutional Repository

আলী, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, নুরউদ্দীন আহ্মেদ প্রভৃতি বহু সংখ্যক রাজনীতিবিদগনকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে দূর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। যদিও এসব মিথ্যা অভিযোগের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিলনা। অধিকাংশ রাজনীতিবিদগনের ছয় বছরের জন্যে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় এবং Electoral Bodies Disqualification Ordinance (EBDO) এর মাধ্যমে আইউব খান ১০ বছরের জন্যে তার ক্ষমতাকে নিস্কন্টক করে নেন।

১৯৬২ সালে ২৫ জুন পূর্বপাকিস্তানের ৯ জন রাজনৈতিক নেতা সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান গ্রহন করার জন্যে যৌথ বিবৃতিতে দাবি জানালেন। ইতিমধ্যে সোহরাওয়ার্দী মুক্তিলাভ করলেন এবং তিনি ঐ বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন, যা ছিল পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বড় আঘাত। তার নেতৃত্বে যে গনতান্ত্রিক শক্তিগুলো পুনর্গঠিত হচ্ছিল, তা আবার পিছিয়ে পড়ে। তবুও এ সময় আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলো পুনর্গঠিত হচ্ছিল। এবার সকল বিরোধীদল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং Combined opposition parties বা (cop) গঠন করে। তারা আইউব খানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যে চাপ দেয়। যৌথ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ফাতেমা জিন্নাহ্কে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দাড় করানো হয়। এসময় আইউব খানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অনাস্থা এবং ফাতেমা জিন্নাহ্র পক্ষে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। জনগণ আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বোচ্ছার হতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সর্বস্ত রের জনগনকে স্বতস্ফূর্তভাবে ভোটের অধিকার দেয়া হলো না। শুধু মাত্র আইয়ুব খানের অনুগত মৌলিক গনতন্ত্রীদেরকে ভোটের অধিকার দেয়া হলো। এদিকে ফাতেমা জিন্নাহ্ পূর্বেই ঘোষনা দিয়েছিলেন যে, তিনি ক্ষমতাসীন হলে মৌলিক গনতন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব করবেন। সে কারণে ভোটাররা আইউব খানকে ভোট দিলেন। আইউব খান মাত্র ৫৩% ভোট পেয়ে ছিলেন। যদি সর্বস্তরের জনসাধারনের ভোটের অধিকার থাকতো, তাহলে জনগন অবশ্যই ভোটের মাধ্যমে স্বৈরশাসক আয়ুব খানকে বর্জন করতো।

যা হোক আইউব খান এসময় ভীষণ কঠিন সময় অতিবাহিত করছিলেন। আইউব বিরোধী গনতান্ত্রিক আন্দোলন তখন ও চলছিল এবং ক্রমশ তা জোরদার হচ্ছিল। ইতিমধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এর উদ্দেশ্য ছিল গনতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে জনগনের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যদিকে ব্যস্ত রাখা। এ যুদ্ধ মাত্র ১৭ দিন স্থায়ী হলো এবং গুরুত্বহীন ও অকার্যকর প্রতীয়মান হলো। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পূর্ববাংলায় নিরাপত্তার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের কোন মাথাব্যাথা নেই। কারণ যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার জন্যে পাকিস্তান সরকার তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। পাকিস্তান সরকারের সাময়িক প্রস্তুতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে ঘিরে। জনমনে এরূপ ধারনা বদ্ধমূল হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নির্ভর করছে ভারতের মর্জির উপর। ভারত যদি ইচ্ছা করে যে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে পারে তাতে পশ্চিম পাকিস্তান কিছুই করবে না। এতে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পূর্বপাকিস্তানের জনগণ পাক সরকারের প্রতি আস্থা হারায়। পাক সরকার এসময় যুক্তি দেখালো যে, যদি ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমন করে, তবে পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমন করে দিল্লী দখল করে নেব; আর তখন ভারত বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দেবে। পাকিস্তান সরকারের এই যুক্তি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অকার্যকর প্রমাণ হয়। কারণ এসময় ভারত খুব সহজেই পূর্বপাকিস্তানে সামরিক প্রাধান্য স্থাপন করে, অথচ পাকিস্তান সরকার পশ্চিম সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারেনি।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আবির্ভূত হলেন অবিসংবাদিত নেতারূপে। তিনি ছয় দফা ঘোষনা করলেন, যার মূল কথা ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ব শাসন। ছয় দফায় বলা হলো পাকিস্তানে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা চালু থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকবে নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি, আর সবকিছু থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রনে। প্রাদেশিক সরকারের কর নির্ধারন ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যে প্যারামিলিসিয়া বাহিনী থাকবে। ছয় দফার দাবিতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু আইউব খান আওয়ামী লীগের নেতাদের হুমকী দিলেন, জবাব দিতে থাকলেন অস্ত্রের ভাষায়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু করলেন দমন ও পীড়ন নীতি। শেখ মুজিব ও আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ সহ শতশত কর্মীদের গ্রেফতার করা হলো। আওয়ামীলীগের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা মামলা দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলো। বলা হলো যে, তিনি ৩৪ জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে ভারতের সহযোগিতায় আগরতলায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। যা ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত।এই মামলাকে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে প্রচার করা হলো।ফলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র মূলক মামলা দায়ের করা হলো। এই ঘটনা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। আওয়ামী লীগের আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে শেখ মুজিবকে হত্যার হীন ষড়যন্ত্রের কথা জনগন বুঝতে পারলো। ফলে জনমনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হলো। দেশে শুরু হলো আইউব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যূত্থান । পূর্ব পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রভাবে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন সারা বাংলার ছাত্ররা মিটিং মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এদিকে সারা পূর্ব বাংলায় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ঐ সংগ্রাম পরিষদে এগার দফার ভিত্তিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে।

উনসত্তরের গণআন্দোলনে ছাত্রদের এগার দফা দাবিনামা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ছাত্র সমাজ কতৃক প্রদত্ত এগার দফা যে জনগনের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল তার কারণ ঐ দাবির মধ্যে বাংলাদেশের সব পেশা ও সামাজিক শ্রেনীর জনগনের দাবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। উনসত্তরের গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে এবং ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দাবি তীব্র আকার ধারন করে। ২০ জানুয়ারী ১৯৬৯ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে ঢাকা ও সারা পূর্ব বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাএরা মিছিল বের করে। পুলিশ, ও ই পি আর, বাধা দেওয়ায় মিছিলটি কয়েক খন্ডে বিভক্ত হয়ে ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি একটি মিছিল যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন। আসাদের মৃত্যুতে ছাত্র ও জনগনের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌছায় এবং ২১ জানুয়ারী ঢাকায় সাধারন ধর্মঘট পালন করা হয়। ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মশাল মিছিল বের হয়। এদিকে ২৪ জানুয়ারী হরতালের ডাক দেওয়া হয় এবং এই হরতাল এক গণঅভ্যুত্থানে পরিনত হয়। ঢাকার রাজপথে ছাত্র শ্রমিক কর্মচারীদের মিছিলের ঢলনামে। সরকারের মদদপুষ্ট প্রতিরক্ষাবাহিনী পুনরায় মিছিলের উপর গুলি চালালে ঢাকার নবকুমার ইনষ্টিটিউট এর দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান নিহত হয়। '৬৯ এর ১৫ফেব্রুয়ারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। আরেকজন আসামী সার্জেন্ট ফজলুল হক গুরুতর আহত হন। ১৮ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহাকে গুলি করে ও বেয়োনেট চার্জকরে হত্যা করে।এতে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারন করে।

এদিকে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে মহান শহীদ দিবস পালন করা হয়। এইসব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আইউব সরকার বুঝতে পারে যে, গণআন্দোলনকে রোধ করা সম্ভব নয়। "২১ ফেব্রুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট আইউব খান রেডিওতে ঘোষনা করেন তিনি আর পরবতী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।"[১৬] অতঃপর ১৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইউব খান জাতির উদ্দেশ্যে বলেন "আমাদের দেশের ধ্বংস স্তূপের উপর সভাপতিত্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"[১৭]

২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসন আমলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অত্যন্ত প্রত্যাশিত সাধারন নির্বাচন । ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২ টি জাতীয় পরিষদের আসনের মধ্যে ১৫৩ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর '৭০ তারিখের প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮২ টির নির্বাচন সমাপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী জাতীয় পরিষদের ৯ টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৮ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহে যথাক্রমে ৭ই ডিসেম্বর '৭০ এবং ১৭ ডিসেম্বর '৭০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ

প্রদেশসমুহের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতিয় এলাকা	৭	-
মোট	৩০০	১৩

১৬

প্রাদেশিক পরিষদ

প্রদেশ সমুহের নাম	সাধারন	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	৬০০	২১

১৭

নির্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষনার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে ও প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা নিম্মরূপঃ

১৬। প্রফেসার আ, ফ, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত; ঐ পৃঃ ১৯৬।

১৭। ঐ পৃঃ ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

	জাতীয় পরিষদ	জাতীয় পরিষদ (মহিলা আসন)	প্রাদেশিক পরিষদ
আওয়ামী লীগ	১৬০	৭	২৮৮
পি ডি পি	১	০	২
জমিয়াতে ইসলাম উলেমা-এ-ইসলাম নেজাম-এ-ইসলাম	০ ০ ১		
জামাতে ইসলাম	০	০	১
ন্যাপ(ওয়ালী)	০	০	১
স্বতন্ত্র	১	০	৭
মোট	১৬২	৭	৩০০

২০

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০টি আসনে আওয়ামী লীগ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় পরিষদে ৭ জন নির্বাচিত হন। নির্বাচনে ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি হিসেবে স্বীকৃত হন। ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামীলীগ সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহন করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয়ও প্রাদেশিক কার্য নির্বাহী সদস্যরাও অংশ গ্রহণ করেন। এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারী জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় আহূত ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান।

৬ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর নিয়োগ করে তাকে কঠোর হাতে আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য নির্দেশ দেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অসংখ্য মানুষের বিশাল জনসমুদ্রে এক

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণটি স্বাধীনতার সবুজ সংকেত হিসাবে চিহ্নিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের ১২ জন নেতাকে ১০ মার্চ ঢাকায় এক বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রন জানায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই আমন্ত্রন প্রত্যাখান করে বলেন যখন বাঙ্গালীদের হত্যা করা হচ্ছে তখন এই আলোচনার আহ্বান একটি নির্দয় তামাসা। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সৈন্য ও ট্যাংক বের হয়। সব ব্যারিকেট ভেঙ্গে তারা অপারেশন সার্চলাইট এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বেরিয়ে পড়ে ঢাকা শহরে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে এক নতুন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পকিস্তান নামে দু'টি ভূ-খন্ড নিয়ে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। (পূর্ব বাংলা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরীত হয়)। কিন্তু ২৪ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ভাষা সহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সর্বতোভাবে বঞ্চিত। ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্ত ানের জনগণ নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্ররাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ২৪ বৎসরের দীর্ঘ দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঊষালগ্ন থেকেই ঢাকা জাদুঘর পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহ ও গবেষনার কাজ চলছে। জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ভিত্তিক দু'টি গ্যালারী রয়েছে। ১৯৯২ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের ব্যবহৃত ও স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শন ভিত্তিক একটি গ্যালারী স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। যা জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের নিম্নরূপ নিদর্শন গুলো সংগৃহীত রয়েছে। (১)

Dhaka University Institutional Repository

অস্ত্র (২) দলিল/ডকুমেন্ট (৩) আলোকচিত্র (৪) সংবাদপত্র (৫) লীফলেট/ ব্যাজ/ স্টীকার্স (৬) বই (৭) পোষ্টার ইত্যাদি।

জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ থাকায় এই নিদর্শনগুলোর সঠিক লিপিবদ্ধকরণ এবং তার ভিত্তিতে গবেষনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করতে পারছিলাম। আমার প্রস্তাবিত গবেষনা কর্মটি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনাদির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পুনগর্ঠনের একটি প্রয়াস। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গবেষনার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রামান্য সংযোজন হবে বলে আশা করছি।

১৮। প্রফেসার আ, ফ, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত; ঐ পৃঃ১৯৬

১৯। ঐ, পৃ-১৬৯

২০। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন :

ক. মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র

"২৫ শে মার্চ রাতে ঢাকা শহরের নিরস্ত্র জনতার উপর পাক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল সহ রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় ইষ্টবেঙ্গল রাইফেলস এর সদরদফতরের উপর আক্রমণের ফলশ্রুতিতে ঢাকার বাইরে ঘটনা মোড় নেয় অভাবনীয় বিদ্রোহের পথে" [১]। ২৫ শে মার্চ রাত থেকে শুরু করে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাক বাহিনীর এই গণহত্যার প্রতিবাদে দেশের সাধারণ মানুষ সহ ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট এর বিভিন্ন শাখা পুলিশ, আনসার ও বিভিন্ন বিওপি গুলোতে অফিসার ও জেসিও দের নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়। দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষার মিলিত তাগিদে এদেশীয় সন্তানরা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাকবাহিনীর মোকাবেলায় ইষ্টবেঙ্গল রাইফেলস ব্যাপক ও কার্যকারী ভূমিকা পালন করেন।

১. মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে - ৮ ম ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস, চট্টগ্রাম থেকে ২৫ শে মার্চ রাতে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন।

২. মেজর শফিউল্লাহ এর নেতৃত্বে ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস জয়দেবপুর থেকে (রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট) ২৭ শে মার্চ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

৩. শাফায়েত জামিল এর নেতৃত্বে ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস, ২৭ শে মার্চ সকালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ২৬ শে মার্চ রাতে সিলেটের শমশেরনগর থেকে ৪র্থ ইষ্টবেঙ্গল রাইফেলস এর আলফা কোম্পানী নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ২৭ শে মার্চ এই কোম্পানী ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে শাফায়েত জামিলের সৈন্যদের সাথে যোগদান করেন এবং খালেদ মোশাররফ এই কোম্পানীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৪. ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস,যশোহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহ করেন।

৫. ২৯শে মার্চ লেঃ আনোয়ার এর নেতৃত্বে ৩য় ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহ করেন এবং প্রায় একই সাথে অন্যান্য

কোম্পানী গুলো সারা বাংলাদেশ থেকে (তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান) বিদ্রোহ করে। ছাত্র, যুবক, কৃষক থেকে শুরু করে পুলিশ, আনসার সহ সকল স্তরের জনগন এই বিদ্রোহে অংশ নেন। প্রাথমিক প্রতিরোধে আধুনিক অস্ত্র সহ কামান থেকে শুরু করে লাঠি,

Dhaka University Institutional Repository

সোটা, বল্লম, বর্শা, তীর, ধনুক, বন্দুক, রাইফেল ও হাতে তৈরী কামান ব্যবহার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আধুনিক অস্ত্রের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে উপজাতীয়দের হাতে তৈরী তীর ধনুক, তুর্নী ও হাতে তৈরী কামান। তেমনি একটি হাতে তৈরী বন্দুক ও কামান এবং উপজাতীয়দের তীর ধনুক, তুর্নী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নং গ্যালারীতে (মুক্তিযুদ্ধ - ২) প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকেই ভারতীয় সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত ছিল। যদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে এদের কে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারত কে সর্বদা পাকিস্তান ও চীনের যৌথ প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ রাখতে হতো। "মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৩০ শে এপ্রিল । ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ইচ্ছুক বাংলাদেশের তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিং দানের দায়িত্ব। এপ্রিল মাসে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষিপ্ত ভাবে যে ট্রেনিং, অস্ত্র সরবরাহ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে চলছিল তার উন্নতি ঘটে। ভারতীয় সেনাবাহিনী চার সপ্তাহের একটি ট্রেনিং কোর্স চালু করে। এখানে শেখানো হয় হালকা অস্ত্র চালানো ও বিস্ফোরকের ব্যবহার। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় দুই হাজার ছাত্র ও যুবকের প্রথম দলের ট্রেনিং''[২]।

এদিকে ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন হয়। আগষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল দশ হাজারের মত, কিন্তু চুক্তির ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ''সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ২০ হাজার করে প্রতিমাসে, মোট ৬০ হাজার মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া অস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটে।

এমনকি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দখল করা জার্মান ও পশ্চিম ইউরোপীয় পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে ব্যবহৃত হবে জেনে জুলাই আগষ্টে ভারতের হাতে তুলে দেন''[৩]।

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের উৎসঃ

১. ইষ্টবেঙ্গল রাইফেলস এ বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে প্রাপ্ত মাঝারি ও ভারী অস্ত্র। এগুলো বেশীর ভাগই ছিল চীন ও আমেরিকার তৈরী।

২. তৎকালীন ই. পি. আর. এবং তার বিভিন্ন শাখা থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র।

৩. পুলিশ লাইন ও আনসার বাহিনীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র।

১। মাঈদুল হাসান: মূলধারা '৭১; পৃঃ ৫
২। ঐ, পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

৪. বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে প্রাপ্ত শর্টগান, বন্দুক প্রভৃতি।

৫. বন্ধু প্রতীম দেশ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র।

৬. মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল, পাকবাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করে, তাদের হালকা মাঝারী সব ধরনের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া। যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাকবাহিনীর উপর প্রয়োগ করা হতো।

‘‘স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় কাদেয়িরা বাহিনীর ‘জাহাজ মারা’ এ্যামবুশ অপারেশন থেকে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিল উদাহরণ হিসাবে তার একটি তালিকা নিম্মে দেওয়া হলোঃ

১। ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা : ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টি

২। চাইনিজ আড়াই ইঞ্চি মার্টারের গোলা : ১০, ০০০ (দশ হাজার) টি

৩। ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা : ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টি

৪। ৮২ মিঃ মিঃ ব্লান্ডারসাইট গোলা : ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টি

৫। ৭২ মিঃমিঃ আর. আর. গোলা: ১২,০০০ (বার হাজার) টি

৬। ৬ পাউন্ডার গোলা : ৭,০০০ (সাত হাজার) টি

৭। ১২০ এম. এম. জি. গুলি : ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) বাক্স

৮। চাইনিজ রাইফেল : ৫০০ (পাঁচশত) টি

৯। ৩০৩ রাইফেল : ১০০ (একশত) টি

১০। ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড : ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টি

১১। স্মোক গ্রেনেড : ১০,০০ (দশ হাজার) টি

১২। চাইনিজ এল. এম. জি : ২ (দুই) টি

১৩। চাইনিজ ৭.৬২ রাইফেলের গুলি :১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টি

১৪। চাইনিজ ৭.৬৫ এল. এম. জি. গুলি :২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টি

১৫। ৩০৩ রাইফেলের গুলি : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টি

১৬। চাইনিজ এল. এম. জি: ৫০০ (পাঁচশত) টি

তখনকার সময়ের হিসাব অনুযায়ী মোট ২৮ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা- বারুদ ছিল ঐ জাহাজ দুটিতে’’[৪]।

৩। ঐ পৃঃ ৭৪

৪। লেঃ কর্ণেল (অব) নূরন্নবী খান বীর বিক্রমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮/১/৭২ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীরউত্তম) এর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের পাশাপাশি অস্ত্র সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হয়, প্রশ্ন টি ছিল আপনি কোথা থেকে হাতিয়ার পেতেন? আপনাকে কারা হাতিয়ার সরবরাহ করতো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কেন চীন ও আমেরিকা । অবাক হচ্ছেন বুঝি? অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা তারা পাকবাহিনীকে হাতিয়ার দিতো, আর আমরা পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিতাম। প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্রের প্রাধান্য কম থাকলেও যুদ্ধের ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন ভাবে অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। এ প্রবন্ধে সেই বিষয়ে কিছুটা আলোক পাত করার চেষ্টা করা হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যবহৃত কিছু অস্ত্রের আলোচনা করা হলো ঃ

১. মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিরোধে ৬ পাউডার গান ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়। ইপিআর এর সদস্যরা এই ৬ পাউডার গান এবং তার গোলা সহ বিদ্রোহ করেন। আমেরিকার তৈরী এই গান গুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী। মাত্র ৬ পাউন্ড ওজনের তৈরী এর গোলার ধবংস ক্ষমতা ছিল সামান্য। এ গানের গোলা নিক্ষেপের দূরত্ব ছিল ২০০০ গজ। পরবর্তী কালে এই গানের গোলা ফুরিয়ে যাওয়ার পরে এগুলো মুক্তিযুদ্ধে আর ব্যবহৃত হয় নি। এমনি একটি ৬ পাউডার গান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিজয় কেতন জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

২। ৩.৭ ইঞ্চি কামান ১ ফিল্ড ব্যাটারী যা মুজিব ব্যাটারী নামে পরিচিত। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অস্ত্র তৈরী, ৩.৭ ইঞ্চি ৬ টি কামান নিয়ে আর্টিলারী ব্যাটারী গঠিত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ৪র্থ ও ৯ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অপারেশনে ১ ফিল্ড ব্যাটারী আর্টিলারী ফায়ার সাপোর্টের মাধ্যমে অসামান্য অবদান রাখে। ২২ শে নভেম্বর সালদা নদী দখলের যুদ্ধে মুজিব ব্যাটারীর ভূমিকা অবিস্মরনীয় (এটি বিজয় কেতন জাদুঘরে প্রদর্শিত)।

৩। ১২০ মিঃ মিঃ মর্টারঃ

১২০ মিঃ মিঃ মর্টার যা ভারী মর্টার হিসাবে পর্যায়ভুক্ত, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে এ ধরনের কোন মর্টার ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন যুদ্ধে কয়েকটি ১২০ মিঃ মিঃ মর্টার পাক বাহিনী কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ফ্রান্সের তৈরী এই মর্টার ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্যবহার হয়েছিল। সীমিত সংখ্যায় হলেও '৭১ শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতার সাথে এই মর্টার গুলো ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও আরো যে সব অস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্ন রূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রঃ

1. 9 MM স্টেন SMG Mark – 5 (U.S made)
2. 7.62 MM LMG, T- 56 (do)
3. 7. 62 MM SLR L- 2A. 1 (do)
4. 9 MM স্টেন SM.G Mark –2 (do)
5. গান মেশিন 1A.3 (U.S made)
6. 303 ব্রেন LMG mark- 2 (do)
7. 7.62 MM Auto reifle – 56 (do)
8. 9 MM Starling S.M. G mark LLA3 (U.S made)
9. মেশিন গান 1A3 (U S)
10. 40 M.MR L T. 56 (US mark)

(উৎস- বিজয় কেতন যাদুঘর)

এছাড়া ভারী অস্ত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু অস্ত্র হলো ১০৬ মিঃ মিঃ রিকয়েললেস রাইফেলস, ১২০ মিঃ মিঃ মর্টার, ১০৫ মিঃমিঃ কামান ইত্যাদি।

এই সব অস্ত্র ছাড়াও আরো যে অস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো গ্রেনেড রিভলবার, পিস্তল, কারবাইন, টি এন্ড টি স্ল্যাব, প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ,২ ইঞ্চি মর্টার, রকেট লাঞ্চার ইত্যাদি।

তেমনি কিছু অস্ত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র

ই- ৯২.৮৭১ রাইফেল- দৈঃ ৭৭ সেঃ মিঃ

ই- ৯২.৮৬৯ রাইফেল - দৈঃ ৮৪ সেঃ মিঃ

ই- ৯২ ৮৫০ এলএমজি- দৈঃ ৮৮ সেঃ মিঃ

ই- ৯২. ৮৫৭ এস এম জি - দৈঃ ৭৫ সেঃ মিঃ

ই- ৯২. ৮৫৪ এস এম জি - দৈঃ ৭৫ সেঃ মিঃ

ই- ৮৬. ৬০৬২ - হাতে তৈরী কামান - দৈঃ ৬১ সেঃ মিঃ

ই- ৯২.৮৬৭ - রাইফেল

ই- ৯২. ৮১৮ ব্রোইং মেশিন গানের অংশ

ই- ৯২. ৮৬৩ ডামি রাইফেল

ই- ৯২. ৮৭৯ কাটা রাইফেল

ই-৯২. ৮২৪ মর্টারের অংশ

Dhaka University Institutional Repository

ই- ৯২. ৮২৫ রকেট লাঞ্চারের অংশ

ই- ৯২.৮৪৩ স্টেনগান

ই-৯২.৮৫১ গ্যাস বন্দুক বিমান বিধংসী কামানের নল

এবং

উপজাতীয়দের ব্যবহৃত অস্ত্র

ই- ৮৬.৬০২৫- বন্দুক

ই- ৮৬.৬০২৬ - তীর ধনুক ও তুনার

১৯৭১ সালে আদিবাসীরা বাঙালী সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি সমানভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। আদিবাসীরা যুদ্ধ করতে গিয়ে সাধারণ অস্ত্র- শস্ত্রের পাশাপাশি দেশীয় হাতে তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঙালী যোদ্ধারা হাতে তৈরী কামান থেকে শুরু করে দা, বটি, খোন্তা প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল। তেমনি কিছু হাতে তৈরী অস্ত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁওতালদের হাতে তৈরী বন্দুক ও তীরধনুক। নিম্নে এই অস্ত্রগুলোর গঠন প্রনালী নিয়ে এবং এর কার্যকারিতাসহ আলোচনা করা হলো।

বন্দুকঃ সংগ্রহ নং ই-৮৬.৬০২৫, লম্বা পানির পাইপ দিয়ে তৈরী হাতে বানানো বন্দুকটি দু টি অংশে বিভক্ত। সামনের অংশটি লম্বা এবং পেছনের অংশটি অপেক্ষকৃত ছোট। লম্বা অংশটির উচ্চতা ৬২ সে.মি. এবং ছোট অংশটি ২০সে.মি। দু টি অংশ মিলে বন্দুকটির উচ্চতা ৮২ সে. মি. ছোট অংশটির নিচে ত্রিভূজ আকৃতির একটা হাতল রয়েছে যাতে বন্দুকটি বহন করা সহজ সাধ্য হয়। এই হাতলসহ মূল বন্দুকটির উচ্চতা ৯৮ সে.মি.। বন্দুকটির উপরের লম্বা পাইপ এবং নিচের ছোট পাইপ দু'টি একত্রে লোহার পাত ও স্ক্রু দিয়ে জোড়া দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বন্দুক তৈরী করা হয়েছে। বন্দুকটির সামনের লম্বা পাইপের ভেতরটি ফাকা। পেছনের অংশে স্প্রিং দেওয়া এবং পেছনের পাইপের অগ্রভাগটি স্প্রিং এর সাথে সংযুক্ত। পেছনের অংশে ৬ সে. মি. উচ্চতা সম্পন্ন একটা লোহার পেরেক রয়েছে যা বন্দুকের ট্রিগার হিসাবে ব্যবহৃত হতো। বন্দুকের পেছনের অংশের লম্বা লোহাটি (ট্রিগার) টেনে এনে গুলি ভরে ছেড়ে দিলে বন্দুকের সামনের নল দিয়ে তা বের হতো। বন্দুকের লম্বা পাইপের শেষের অংশের উপরিভাগে এবং ছোট পাইপের সামনের অংশের উপরিভাগে আলাদা লোহার পাত দিয়ে আচ্ছাদিত।

Dhaka University Institutional Repository

তীর, ধনুকঃ সংগ্রহ নম্বর ই- ৮৬.৬০২৬। উপজাতি সাঁওতালদের কিছু উল্লেখযোগ্য অস্ত্র হিসাবে তীর ধনুক, জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। আদিবাসী সাঁওতালরা স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রু মুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের হাতে তৈরী তীর ধনুক দিয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। হানাদার বাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত সুশোজ্জিত দলের কাছে তাদের তীর ধনুক যে সাধারণ দুর্বল অস্ত্র ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষার্থে এই আদিবাসী গোষ্ঠি তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শত্রু মোকাবেলার চেষ্টা করেছে। এই গ্যালারীতে মোট ৪ টি তীর ও ৪ টি ধনুক রয়েছে। তীর চারটি বাঁশের চিকন কুঞ্চি (প্রায় ১/২ ইঞ্চি চিক কুঞ্চি) অগ্রভাগে লোহার পাতের ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা রয়েছে। এগুলো অত্যন্ত হালকা এবং যা দিয়ে মানুষ হত্যা করা কঠিন। কিন্তু তবুও আদিবাসী গোষ্ঠি তাদের সীমিত জ্ঞান এবং সমর্থ দিয়ে নিজের হাতে এই অস্ত্র তৈরী করেছিলেন। অস্ত্র হিসাবে তীর ধনুক হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু সাঁওতাল আদিবাসীদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার।

পাক সুসজ্জিত বাহিনীর আক্রমণের মুখে, হাতে তৈরী অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল মারা যায়। আসন্ন মৃত্যু জেনেও এই আদিবাসী গোষ্ঠি লড়াই করতে পিছপা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র

ছবি কথা বলে। হাজারটি শব্দের চাইতে একটি আলোকচিত্র বেশী শক্তিশালী। আলোকচিত্র মানুষকে আকর্ষণ করে। আলোকচিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো তার সংবাদ মূল্য। প্রত্যক্ষতার আমেজ সংবাদ চিত্রের প্রাণ। মানুষের কাছে আলোকচিত্রের ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন ও পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পত্র পত্রিকায় তুলে ধরতে আলোকচিত্রের ভূমিকা ছিল অনন্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রসমূহ বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে পরিচিত করার ক্ষেত্রে আলোকচিত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই আলোকচিত্রের মাধ্যমে এ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করতে পারে, চেতনাকে বিকশিত করতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু আলোকচিত্রে মুক্তিযুদ্ধঃ

মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. প্রাক মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র (১৯৪৮ - ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের আগ পর্যন্ত)

২. মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত)

প্রথম পর্যায়ের আলোকচিত্রের সময়কাল ১৯৪৮-১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্র পর্যন্ত। এই সময় এর প্রচুর আলোকচিত্র রয়েছে। তাছাড়া কিছু ছবি, এলবাম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- আলোকচিত্রী কামরুল হুদার প্রকাশিত এলবাম, শফিকুল ইসলাম স্বপনের প্রকাশিত এলবাম, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর থেকে প্রকাশিত এলবাম হাজার বৎসরের বাংলাদেশ, আফতাব আহমেদের বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সিরাজউদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব প্রভৃতি।

বিশ্লেষণের প্রথম পর্যায়ে আসে ভাষা আন্দোলনের আলোকচিত্র। এই আলোকচিত্রসমূহ হলো ঃ ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সচিবালয় অভিমুখে ছাত্র জনতার মিছিল, ছাত্র জনতার মিছিলে সরকারি বাহিনীর ব্যারিকেড। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে পাকিস্তানের তৎকালীন গর্ভণর কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষনা করেন -পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দূ, অন্য কোন ভাষা নয়। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ছাত্র জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সচিবালয় অভিমুখে মিছিল করে অগ্রসর হয়। তেমনি আরো একটি আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ছাত্র জনতার মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ করার জন্য সরকারী বাহিনীর ব্যারিকেড যাতে ছাত্র জনতা আর অগ্রসর না হতে পারে।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক অপর একটি উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র হলো ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পূর্ব প্রস্তুতি। বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে কিন্তু সরকার এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করলে ভাষা আন্দোলনের সেদিনই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে বিধায় ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২ সালে) সকালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র হলো প্রথম শহীদ মিনারের আলোকচিত্র। এই আলোকচিত্রটি বাঙ্গালী জাতীয় চৈতন্য মুক্তির ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভিন্নতর মোড় নেয়, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এদিনে ভাষা শহীদ রফিক, জব্বার, বরকত, সালামের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। এই দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য বাংলার ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে প্রথম শহীদ মিনার গড়ে তোলা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর কাছে। ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক আলোকচিত্রগুলো তুলেছেন জনাব মুহাম্মদ তকীউল্লাহ।

পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক আলোকচিত্র দেখা যায় তা হলো- ৬২ ও ৬৪ শিক্ষা কমিশনের আন্দোলনের আলোকচিত্র, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬ দফা, ১১ দফা, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন সহ বিভিন্ন সময়ের সংগ্রাম ও অধিকার আন্দোলন, ৭০ এর জলোচ্ছ্বাস ও সাধারণ নির্বাচন। এইসব আলোকচিত্রগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিন্মে কিছু আলোকচিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

৭ ই মার্চের ভাষণ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল মূলতঃ স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন।বাঙ্গালী কিভাবে এগিয়ে যাবে, কিভাবে নিজকে রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করবে তার দিক নিদের্শনা এই ভাষণে দেওয়া রয়েছে। তিনি বলেছেন তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর- ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। যে কয়েকটি ভাষণ সারা বিশ্বে এযাবৎকালে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এই বিখ্যাত ভাষণটি তার মধ্যে অন্যতম। পন্ডিতগণ মনে করেন যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন এর গ্যাট্রিসবার্গ এ্যাড্রেসের সমতুল্য বা এর চেয়েও বেশী কিছু। পার্থক্য হলো লিংকন এর ভাষণটি ছিল লিখিত এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল অলিখিত। ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল মাইল ফলক। ৭ ই মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ ১৯৭২ সালের দৈনিক বাংলা পত্রিকাতে "একটি জাতির জন্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালের সাপ্তাহিক বিচিত্রাতে লেখেন যে,৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীণ সিগনাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোকচিত্রের সময়কাল হলো ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কাল রাত থেকে শুরু করে ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত । এ পর্যায়ে আলোকচিত্র সমূহকে কয়েকটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন- গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতাসহ বেশ কিছু আলোকচিত্র। '৭১ এর গণহত্যা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক সৃষ্টি করে। পাকবাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে । মানুষকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে গনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী জনতা একাত্রিত হয়ে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করতে সহায়তা করেছে। দেশী ও বিদেশী ক্যামেরাম্যানদের ক্যামেরায় বন্দী হাজার হাজার গণহত্যা ভিত্তিক আলোকচিত্র পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করেছে। এই আলোকচিত্রগুলো আমাদের আগামী প্রজম্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করবে। মুক্তিযুদ্ধের এই সব আলোকচিত্রগুলো পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনিভাবে এই আলোকচিত্র বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে সহায়তা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ আলোচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্রের ব্যাখ্যা করা হলো। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক আলোকচিত্র দেখা যায় গণহত্যামূলক।

১। গণহত্যা :

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সাড়া বাংলায় শহীদ হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী । আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ পাকবাহিনীর নরকীয় অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই। ২৫ মে মার্চ কালরাত্রিতে ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমনের মধ্যে দিয়ে এই দানবীয় হত্যাকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। বিশ্বের ইতিহাসে এই রাত ঘৃন্যতম হিংস্রতায় চিহ্নিত সময়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সদস্যরা গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে বর্বর এক দানবীয় নিষ্ঠুরতায় সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে তারা নরকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। সে হত্যাকান্ড ১৯৪২ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের গেষ্টাপো বাহিনীর নিধনযজ্ঞের চেয়েও নির্মম আর পাশবিক।

বাঙ্গালীর জীবনে নেমে আসা ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে সমগ্র বিশ্ববাসী। ১৬ ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর পাক সেনাদের নিষ্ঠুর নরকীয়তায় বিধ্বস্ত হলো দেশ, বিনষ্ঠ হলো সম্পদ, ধ্বংস হলো রাস্তাঘাট, ২ লক্ষ মা বোন হলেন ধর্ষিতা, মৃত্যুবরন করলো এদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ। ৭১ এর পাকবাহিনীর নৃশংসতা ছিল মানব অধিকারে নির্মম লংঘন। নির্বিচারের মানুষকে হত্যা দেখে বিশ্ব বিবেক চমকে উঠেছিল। ১৯৭১ সালে ২৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট পরির্বতন হয়। পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো। ক্ষমতায় এসেই তিনি হামুদুর রহমান তদন্ত কমিশন গঠন করেন। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান কে সভাপতি এবং বিচারপতি এস আনোয়ারুল হক ও বিচারপতি তুফায়েল আলী আব্দুর রহমান কে সদস্য করে এই কমিটি গঠিত হয়। কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন লেঃ জেঃ আলতাফ কাদির, ১৯৭৪ সালে এই কমিশন তার চূড়ান্ত রির্পোটি পেশ করে। এই কমিশন পাক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছে।

এগুলোর নিম্নরুপ

Dhaka University Institutional Repository

১। ঢাকায় ১৯৭১ - এর ২৫ও ২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরুর সময় অত্যাধিক শক্তি প্রয়োগ ও গোলাগুলি চালানো।

২। সামরিক পদক্ষেপ শুরুর পর গ্রামাঞ্চলে দুঃস্কৃতকারী মুক্ত করার অভিযানে র্নিবিচারে হত্যা ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

৩। শুধু সামরিক অভিযানের প্রথম দিকেই নয় -১৯৭১ এর ডিসেম্বরে চূড়ান্ত পর্যায়ে বুদ্ধিজীবি, ডাক্তার, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবিদের হত্যা ও গণকবরে পুতেরাখা।

৪। ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যদের, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পূর্বপাকিস্তানের পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করার সময় বা তাদের বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে হত্যা করা।

৫। সামরিক শাসন চালানোর সময় পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হত্যা বা তাদের বাড়ি থেকে রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া।

৬। পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের দ্বারা প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ও অত্যাচারের জন্য বহু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী নারী ধর্ষণ।

৭। সংখ্যা লঘু হিন্দুদের ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করা। কমিশনের রির্পোটে আরো উল্লেখ করা হয় যে, লেঃ কর্ণেল আজিজ আহমেদ খান সাক্ষৎকার দিয়েছেন যে, বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুরের সকল বাড়ী ধবংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার নিয়ন্ত্রনাধীন কর্ণেল সাহেব বহুলাংশে এই নির্দেশ পালন করেছেন। তিনি কমিশনকে আরো জানান যে, ঠাকুরগাঁও ও বগুড়ার তার ইউনিট পরিদর্শন করতে গিয়ে জেনাঃ নিয়াজী সৈন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কত হিন্দু মেরেছো? ২৩ বিগ্রেডের বিগ্রেডিয়ার আব্দুল্লাহ মালিক হিন্দুদের হত্যা করার লিখিত নিদের্শ দিয়েছিলেন”[১]।

২। অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং “১৭ এপ্রিল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (বৈদ্যনাথ তলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী সভার সদস্যদের সাথে ১২৭ জন বিদেশী সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অস্থায়ী সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ গ্রহন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তার ভাষণে বৈদ্যনাথ তলার নাম মুজিব নগর হিসাবে ঘোষণা দেন "[২]।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গার্ড অব অনার পরিদর্শন করছেন। নব্যগঠিত বাংলাদেশ সরকারের গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যরা রাইফেল উচু করে রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির ডানপাশে রয়েছেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম। পিছনে একজন বিদেশী সাংবাদিককে দেখা যাচ্ছে। সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত রাষ্ট্রপতি দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

৩। প্রশিক্ষণরত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা :

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজও যথেষ্ট সাহস, কৃতিত্ব ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছাড়াও নারী সমাজ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন। হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা যত্ন করা, ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য রাজনৈতিক বক্তব্য ও আলোচনায় অংশ নেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ আদান প্রদানসহ অস্ত্র আনা নেওয়া করেছে। তাছাড়া পুরুষের পাশাপাশি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে নারী সমাজ এবং বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারী সমাজের প্রতিনিধি বৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে সভা সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছে।

২৫শে মার্চের পর সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন নারী অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রণাঙ্গনে তারা পাক হানাদার নিধনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। সশস্ত্র যুদ্ধে সাহসী ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য দুজন বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাকে "বীর প্রতীক" খেতাবে ভূষিত করা হয় । এরা হলেন ক্যাপ্টেন ডাঃ সেতারা বেগম বীর প্রতীক এবং তারামন বিবি বীর প্রতীক। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নাম- "শিরিন বানু, ফোরকান বেগম, আশালতা বৈদ্য, করুনা বেগম, রুনাদাস, রমা, বীথিকা, মিনতি, মালতি, তপতি প্রমুখ"[৩]।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং বিভিন্ন এ্যালবামে নারীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মহিলাদের অংশ গ্রহণমূলক আলোকচিত্র মুক্তিযুদ্ধের এক গৌরব উজ্জ্বল দিক। বহু স্থানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন সহ মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছিলেন। মহিলারা সৈন্যদের খাবার ও পোশাক তৈয়ারী করে দিয়েছে। সর্বোপরি মহিলারা রণাঙ্গনে যুদ্ধের পাশাপাশি আহত সৈন্যদের সেবা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারী সমাজের অংশ গ্রহণ গৌরবউজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং পরবর্তী বংশধরদের সেই সাহাসী ভূমিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

৪। প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধা :

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এদেশে নরকীয় অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। ত্রিশলক্ষ মানুষকে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে, নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বহু স্ত্রীকে হারাতে হয়েছে স্বামী, মা কে হারাতে হয়েছে সন্তান। শহর বন্দর গ্রাম গঞ্জে নগর জনপথকে পাকহানাদাররা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল যা মানুষকে আজও বিচলিত করে, আন্দোলিত করে। এ ধরণের বহু আলোকচিত্র বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। দেশ মাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলার মানুষ ছাত্র বৃদ্ধ জনতা যুবা কৃষক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল । তরুন যুবক ছাত্র সম্প্রদায় ঝাপিয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষ যুদ্ধে । সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ আনসার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিছু বাহিনী ছাড়া বাকী সব বীর যোদ্ধারাই ছিল প্রশিক্ষণবিহীন।

বাংলার এই দামাল সন্তানরা মনের জোড়ে দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এই মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অস্ত্র পরিচালনা, সমর যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বাংলার মাটিকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় ও কঠিন শপথ নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে।

১। দৈনিক প্রথমআলোঃ দৈনিক প্রত্রিকা (১৭ই আগষ্ট-২৬শে আগষ্ট) ২০০০ সাল।
২। প্রফেসার আ ফ সালাউদ্দিন আহমেদ অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, পৃষ্ঠা- ২৩৮।
৩। ফোরকান বেগমঃ মুক্তিযুদ্ধে নারী।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে সারা বাংলাতেই স্বাধীনতার পূর্বলগ্ন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। যেমন-"চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিছনে খোলা চত্বরে শুরু হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ। জেলার বেশীর ভাগ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো স্থাপিত হয়েছিল জালালাবাদ পাহাড়, ষোল শহর বন গবেষণা কেন্দ্র, লালখান বাজার পুলিশ লাইনসহ বিভিন্ন এলাকাতে । চট্টগ্রামে ২৫ শে মার্চ কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়নের একটি যৌথ গ্রুপ আদালত ভবনের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্র উদ্ধার করেছিল"[৪]। এদিকে "১৯৭১ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারী রংপুরবাসী, রংপুর প্রেসক্লাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে । ছাত্র যুবক জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে তখন থেকেই পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৮মে মার্চ সর্বস্তরের রংপুরবাসী হাতে তৈরী অস্ত্র নিয়ে সেনানিবাস আক্রমণ করে কিন্তু এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ফলে রংপুর শহর জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাকবাহিনীর ব্যাপক হত্যালীলার পর রংপুরের ছাত্র জনতার একটা অংশ ভারতে চলে যায় এবং আরেকটি অংশ সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুদ্ধ করে। তেমনি রাজশাহীতে আওয়ামীলীগ মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কয়েক হাজার সদস্যের এক বিশাল স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন করে। পাশাপাশি ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন গণবাহিনী গঠন করে "[৫]। "মে মাসে ট্রেনিং এর জন্য ভারত সরকার নিজস্ব সেনাবাহিনী নিযুক্ত করেন"[৬]। বাংলাদেশের মুক্তিযাদ্ধাদের সাহায্যের দায়িত্ব বিএসএফ এর কাছ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী গ্রহণ করে। মূলত তখন থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধবিদ্যায় আধুনিক প্রশিক্ষণ দান কার্যক্রম শুরু হয়। গণবাহিনীর তৈরী কাঠের ডামি রাইফেল দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। এভাবে সাড়া বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং দেশকে স্বাধীন করে।

৫। শরনার্থী শিবিরের দৃশ্য :

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি ছিল বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃনিত সময়। পাকহানাদার দস্যুরা এদিন গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাত ১-৩০ মিনিটে তার নিজ বাসগৃহ থেকে গ্রেফতার করে। ঢাকার পিলখানায় রাত ২-৩০ মিঃ আক্রমণ করে এবং প্রায় ২,৫০০ ইপিআরকে হত্যা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। অনুরূপভাবে রাত ৩ টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করে ।

ভোর পাঁচটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণ চালায় । রক্তের বন্যা ভেসে যায় সাড়া শহর। বাঙ্গালীদের প্রতি প্রথমে জেনারেল টিক্কা খান ও পরে ইস্টার্ণ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী কঠোরতর মনোভাব গ্রহণ করেন। জেনারেল নিয়াজী তার প্রথম বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন বাঙালীদের শত্রু হিসাবে গণ্য করতে হবে। এটা ছিল এক জঘন্য মনোভাব। নিয়াজীর নিজস্ব প্রিজন হাউজ ও কনসেন্ট্রেশন ক্যাপ ছিল। এখানে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হতো বাঙালীদের। পাক বাহিনীর এই বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জোগায় ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াসহ বন্ধুপ্রতীম দেশ সমূহ। তারা এই চরম দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। দেশের প্রায় এককোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে । ভারত সরকার এদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকেই "প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ হাজার শরণার্থী দেশ ত্যাগ করে ভারতে যায়"[৭] এবং সেখানে স্থাপিত বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। জাতি সংঘের মহাসচিব উথান্ট, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোসহ অন্যান্য সরকারী, বেসরকারী সংস্থাকে শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। "সংবাদ পত্র জয়বাংলার ১ম বর্ষঃ ২০ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় কুয়ালালামপুরে ১৪ সেপ্টেম্বর কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বৃটিশ এম, পি ভারতে বাংলাদেশ শরণার্থীদের ৯৫০ টি শিবিরকে ৯৫০ গাজা বদ্বীপ বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন এই ৯৫০ টি শরণার্থী শিবির পাকভারত যুদ্ধের ৯৫০ সম্ভাব্য কারণ হিসাবে বিরাজ করছে। উক্ত সম্মেলনে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ কিথহলিওক জানান, তিনি ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের দাবীকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কে অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্মেলনে শরণার্থী প্রসঙ্গে ঘানার প্রতিনিধি মিঃ সাকিস্তেক কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের সাহায্যে করার জন্য আবেদন জানান।

৪। আসাদুজ্জামান আসাদঃ মুক্তি সংগ্রামে বাংলা পৃষ্ঠা- ১৯৬।

৫। ঐ, পৃ-১৯৮

৬। মঈদুল হাসানঃ মূলধারা '৭১; পৃ- ২৭।

৭। সালাহ উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, ঐ, পৃ-২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বৃটেনের স্যার রোনাল্ড রাসেল, সম্মেলনে জানান পূর্ব বাংলার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাতে পারবে না। তিনি পূর্ব বাংলার সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোড় দেন"[৮]।

৬। যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা

গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যে সব লোককে ট্রেনিং দেওয়া হতো তারা ফ্রিডম ফাইটারর্স নামে পরিচিত ছিল। এদেরকে অনিয়মিত বাহিনী বলা হতো। দেশ মাতৃকার টানে এরা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে। এরা ছিল ছাত্র কৃষক মজুর তথা সংগ্রামী জনতা। প্রাথমিক পর্যায়ে এদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের কিছুটা অভাব থাকলেও দীর্ঘ দিনের কঠোর সংগ্রামী জীবনের মধ্যে দিয়ে এরা সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে। সাধারনত এই বাহিনী গেরিলা বাহিনী নামে খ্যাত ছিল- অর্থাৎ এরা সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের জন্য এই মুক্তি যোদ্ধারা নিজের জীবনকে বাজী রেখে যুদ্ধ করে গেছে।

জীবন ধারণের জন্য নিয়মিত বেতন ভাতা তারা তেমন কিছু পায়নি। তবে ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানোর জন্য কিছু টাকা পয়সা তাদের দেওয়া হতো।

"নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্য সংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড় চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলাবারুদ, অয়্যারলেস সেট, টেলিফোন সেট, কম্পাস, বাইনোকুলার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের তালিকা করে পুরাসেক্টরের
অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ পত্রের সাকুল্য তালিকা সরকারের কাছে পেশ করা হতো"[৯]। যদিও তার বেশীর ভাগই ছিল অপ্রতুল। তবুও অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা। এখানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একটা পত্রের কথা উল্লেখ করা হলো। "১লা অক্টোবর ১৯৭১ সালে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে একটি পত্র দিয়ে জানান যে, খুব শীঘ্রই শীতকাল শুরু হবে।

৮। রবীন্দ্রনাথত্রিবেদী সম্পাদিত, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ- প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র পৃ- ৪৪৬
৯। মেজর রফিকুল ইসলামঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে; পৃ- ১৮৬
১০। মাহমুদুল্লাহ সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র, পৃ- ৪৬৯।
১১। মঈদুল হাসানঃ মূলধারা '৭১; পৃ- ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটিতে গরম কাপড় সরবরাহ করা প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে আমি আমাদের ঘাটিতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যেকের জন্য দুটি করে কম্বল, ১টি করি সোয়েটার/ জ্যাকেট/ চাদর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি। আমি আপনাকে আসাম, মেঘালয় ত্রিপুরা প্রভৃতি পাহাড়ী এলাকায় যেসব মুক্তিযুদ্ধের ঘাটি রয়েছে, সেখানে আগামী ১৫ ই অক্টোবরের মধ্যে গরম কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সাথে আরো অনুরোধ জানাচ্ছি যে, পশ্চিম বঙ্গের সমতলভূমিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘাটি গুলোতে আগামী ৩০ শে অক্টোবরের মধ্যে শীতকালীন গরম কাপড়গুলো সরবরাহ করবেন। এ ব্যবস্থা অতিশীঘ্রই গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। স্বাক্ষর - সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি”[১০]। “এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ৩০ শে এপ্রিল। ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয়, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছুক বাংলাদেশের তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিং দানের দায়িত্ব। এদিকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পরে বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। আগষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের কাছাকাছি। মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর সিদ্ধান্ত হয়, ভারত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসে কুড়ি হাজার করে মোট ৬০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেবে”[১১]। স্থল বাহিনীর পাশাপাশি নৌমুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে মুক্তিযুদ্ধে। এর মধ্যে একটি অপারেশন এর কথা উল্লেখ করা হলো।

১৫ আগষ্ট ১৯৭১ সালে রাতের অন্ধকারে নৌ কমান্ডরা নিছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙরকৃত দুটি ঢাকা জাহাজ এম, ভি আব্বাস এবং এম, ভি হরমুজের গায়ে লিমপেট মাইন লাগিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসে। রাত ১.৪০ মিঃ ও রাত ১.৪৫ মিঃ জাহাজ দুটো প্রচন্ড বিস্ফোরণে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে দ্রুত পানিতে ডুবে যায়। এতে পাক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিনের ঘটনা সর্ম্পকে ১৬ ই আগষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তদন্ত রির্পোটে লেখা হয়েছিল “পরিস্থিতি পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে ক্ষয় ক্ষতি এবং হতাহতের ব্যাপারে জাহাজের কোন ব্যাক্তিকে দায়ী করা চলেনা। কারণ পূর্ব থেকে কিছুই টের পাওয়া যায়নি, এবং গেরিলারা যে এমন ধরনের অভিযান চালাতে পারে বা চালাবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। অবশ্য নদীর দিকটা ভালো দেখা শুনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিন রাত্রির কোন সময়েই

Dhaka University Institutional Repository

কোন নৌকা ইত্যাদিকে আর জাহাজের ত্রি সীমানায় ঘেষতে দেওয়া হচ্ছে না"[১২]। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকাতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। কোন কোন ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে ১ সপ্তাহ আবার প্রয়োজনে কোথাও ২/৩ সপ্তাহ ট্রেনিং দেওয়া হতে। ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণসহ অ্যামবুশের কায়দা কানুন ও রণাঙ্গনের বিভিন্ন কৌশল শেখানো হতো।

"তেমনি একটি ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করা হলো : এটি ছিল রৌমারীতে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করতেন লেঃ কর্ণেল (অবঃ) নূরন্নবী খান। বহু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এদেরকে যুদ্ধে পাঠানো হতো এই ক্যাম্প থেকে"[১৩]। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে বিজয়ের উল্লেখ করা হলো,"১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সহ ১৯ মে লেঃ মোরশেদ তেলিয়াপাড়া চা বাগানের নিকট সড়কের উপর অ্যামবুশ করেন। পাকিস্তানীরা এ ধরণের অর্তকিত আক্রমণ বুঝে উঠতে পারে নাই। শত্রুদের প্রথম গাড়িটি পার হতে পারলেও দ্বিতীয় গাড়ীটি বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায়; তৃতীয়টিও এক নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের হালকা মেশিনগান গর্জে উঠে। শত্রুপক্ষের তিনটি গাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। অ্যামবুশের সময় একজন মুক্তিযোদ্ধাকে শত্রুরা ধরে ফেলেছিল কিন্তু তার সহযোদ্ধারা বীর বিক্রমে আক্রমণ চালিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে"[১৪]।

৭। আত্মসর্মপন :

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমনের মধ্যে দিয়ে যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পন এর মধ্যে দিয়ে তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বন্ধু প্রতীম ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী । তাদের প্রজ্ঞা, দৃঢ়চিত্ত ও সাহসিকতা বাংলাদেশীদের প্রচন্ড মনোবল জুগিয়েছে। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইষ্টার্ণ কমান্ডের লেঃ জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভারতীয় সেনাপ্রধান মানেক'শ ৯ ডিসেম্বর যুদ্ধ বন্ধের জন্য গভর্ণর ড. এ. এম. মালিকের মারফতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এর নিকট বার্তা পাঠান।

১২ ।মেজর রফিকুল ইসলাম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, পৃষ্ঠা নং ২২৬
১৩। সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্ণেল (অব) নূরুন্নবী খান।
১৪। মেজর রফিকুল ইসলামঃ ঐ পৃষ্ঠা- ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জেঃ আমীর আবদুল্লাহ খানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। নিয়াজী পাকিস্তানী কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল হামিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য অনুরোধ জানান। ইয়াহিয়া খান এক বার্তায় নিয়াজীকে যুদ্ধ বিরতি এবং সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। বার্তাটি পাওয়ার পর জেনারেল রাও ফরমান আলী, ইউনাইটেড স্টেটস কনসুলার হার্বাট স্পিভ্যাক এর সাথে দেখা করে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। "রাও ফরমান আলী প্রদত্ত যুদ্ধ বিরতির একটা খসড়া জেনারেল স্পিভ্যাক ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন। এই দিনই (১৪ ই ডিসেম্বর) বিকেলে কলকাতাস্থ কনসুলার অফিসের একজন কূটনীতিক জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল স্পিভ্যাকের আত্মসমর্পনের বিষয়াদি আলাপ আলোচনার কথা মিত্রবাহিনীর জেনারেল জ্যাকবকে জানান। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেক'শ জেনারেল স্পিভ্যাক এর বার্তাটি পান। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল মানেক'শ জানান আত্মসমর্পনের খসড়ায় উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল সোয়া নয়টায় জেনারেল মানেক'শ জেনারেল জ্যাকবকে আত্মসমর্পনের যাবতীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার জন্য ঢাকা যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন"[১৫]।

১৬ ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় মিত্রবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা, উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার, মেজর হায়দারসহ মিত্র বাহিনীর জেনারেলদেরকে জেঃ জ্যাকব ও পরাজিত বাহিনীর জেঃ আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। বিমান বন্দর থেকে তারা সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেন এবং আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনার পরিদর্শনের পর নিয়াজি ও জেনারেল আরোরা আত্মসমর্পণের টেবিলে যান। উল্লেখ্য জেঃ আরোরা আত্মসর্ম্পণের দলিলটি সঙ্গে এনেছিলেন। আত্মসমর্পণের দলিলে প্রথম স্বাক্ষর করেন জেনারেল নিয়াজী পরে প্রতিস্বাক্ষর করেন জেনারেল আরোরা। আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে পরাজিত ভাগ্য বিড়ম্বিত জেনারেল নিয়াজী এবং মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আরোরা কে। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জেনারেল নিয়াজী; পিছনে দাড়িয়ে আছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার এ.কে. খন্দকার এবং মিত্রবাহিনীর অফিসারবৃন্দ। পাকবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাসের। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪. ৫৫ মিঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ে সূচিত হয়।

৮। আত্মসর্ম্পনের দলিল :

পাকবাহিনীর আত্মসর্ম্পন সর্ম্পকে হামুদুর রহমান কমিশন রির্পোটে বলা হয়েছে- যে সব সিনিয়র আর্মি কমান্ডর, সংবিধান ধবংস করে, অপরাধ মূলক চক্রান্তের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করে, তাদের পেশাগত অযোগ্যতার দ্বারা কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃত অবর্ণনীয় অবহেলার দ্বারা, শত্রুকে প্রতিরোধের সামর্থ্য ও সম্পদ শক্তি থাকা সত্ত্বেও দৈহিক ও মানসিক কাপুরুষতা দেখিয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করার মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্য পরাজয় ও অপমান বয়ে এনেছেন তাদের কৈফিয়ত তলব করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে কমিশন একমত। এই আত্মসর্ম্পণের ধরণ সর্ম্পকে ও কমিশনে দুঃখ প্রকাশ করা হয় জেনারেল নিয়াজির সাময়িক পরাজয়ের চেয়েও বেদনাদায়ক হচ্ছে পাকিস্তান ও তার সশস্ত্র বাহিনীকে চিরকালীন লজ্জায় রেখে তিনি যে শোচনীয় কায়দায় ভারতীয় ও মুক্তি বাহিনীর তথাকথিত যৌথ কমান্ডের কাছে অস্ত্র নামিয়ে রেখে আত্মসর্ম্পনের দলিল সই করতে, বিজয়ী ভারতীয় জেনারেল অরোরাকে বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়ে অভ্যর্থনা জানাতে, ভারতীয় জেনারেলকে গার্ড অব অনার দিয়ে এবং অবশেষে রেসকোর্সে জন সম্মুখে আত্মসর্ম্পন অনুষ্ঠানে রাজি হন। সেই ঘটনায় সন্দেহ হয় যে, লেঃ জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধের শেষ দিকে নৈতিকভাবে সম্পূর্ন ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ৭ ডিসেম্বর গর্ভণর হাউজে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে গর্ভণর মালিকের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় গভর্ণরের বক্তব্যছিল নিম্নরুপ "কোন বিষয়ই কখনো একই রকম থাকে না। ভালো পরিস্থিতি মন্দের জন্য পথ করে দেয় আবার উল্টাটাও হয়। একই ভাবে একজন জেনারেলের জীবনে উঠানামা আছে। যশ এক সময় তাকে আচ্ছাদিত করে আরেকসময় পরাজয় তার মর্যাদা কে ধূলিসাৎ করে। গর্ভণরের বক্তব্যের শেষে জেনারেল নিয়াজী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন"[১৬]।

এদিকে বিরাজ মান পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধ বিরতির মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গর্ভণর,ঢাকায় অবস্থানরত জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ পল মার্ক হেনরীকে যুদ্ধ বিরতির একটা খসড়া প্রস্তাব দেন এবং অনুরূপ একটা খসড়া প্রেসিডেন্টকে ও সংকেত বার্তায় প্রেরণ করা হয়। খসড়া টা ছিল নিম্নরুপ "পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ার ইচ্ছা কখনোই পাকিস্তান বাহিনীর ছিলনা। যা হোক এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক কার্যক্রমে বাধ্য করেছে। সর্বদাই পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের মধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা এবং এর জন্য আলোচনা ও হয়েছে। প্রচন্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাকবাহিনী বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়েছে এবং এখনও লড়ে যেতে পারে। কিন্তু আরো রক্তপাত ও নিরাপরাধ মানুষের জীবনহানি এড়ানোর জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাববলী রাখছি। যেহেতু রাজনৈতিক কারণেই সংঘর্ষের সৃষ্টি, এর সমাপ্তিও হতে হবে রাজনৈতিক সমাধানের মধ্য দিয়ে। অতএব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অধিকার প্রাপ্ত হয়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঢাকায় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করতে”[১৭]।

“১৬ ডিসেম্বর বিকেলে বিদেশী সংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে মিত্র বাহিনীর লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও পরাজিত বাহিনীর লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী আত্মসর্ম্পনের দলিলে স্বাক্ষর করেন। সেখানে লেখা আছে- Instrument of Surrender- To Be Signed at 1631 Hours IST (Indian Standard Time) দলিলে স্বাক্ষর দানের পর নিয়াজি তাঁর কাঁধ থেকে এপ্যলেট খুলে ফেলেন এবং ল্যানিয়ার্ড সহ ৩৮ রিভলবার অরোরার হাতে ন্যস্ত করেন”। তখন তার চোখে ছিল পরাজয়ের অসহনীয় বেদনা।

১৫। প্রথম আলোতে প্রকাশ ২০০০ সালে
১৬। সিদ্দিক সালিক, নিয়াজীর আত্মসর্ম্পনের দলিল, পৃ ১৯২।
১৭। ঐ; পৃ ১৯৭
১৮। লেঃ জেঃ জেকব, স্যারেন্ডার অ্যাট ঢাকা; পৃ-১২০

Dhaka University Institutional Repository

গ. পীড়নযন্ত্র

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অসহ্য যন্ত্রনাদান করা কে Torture বা পীড়ন বলা হয়। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী তেমনি একটি পীড়নযন্ত্র বা Torture Machaine এর মধ্যে নিরীহ বাঙ্গালীদের কে ধরে বসিয়ে জিজ্ঞাসবাদ করে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে হত্যা করতো। পীড়ন যন্ত্রটি চাকাযুক্ত; এর সমানের দিকে একটা দরজা রয়েছে। দরজা খুললে এর মধ্যে রয়েছে চেয়ার। জার্মানের তৈরী এই পীড়ন যন্ত্র টার সম্মুখে একটা স্টীকার্স রয়েছে। এতে লেখা BATTLE CREEK–EQUIPMENT NUSAUNA

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে পাকবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালে নিরীহ লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এই চেয়ার ব্যবহার করতো। এই চেয়ারে বসিয়ে বৈদ্যূতিক স্পর্শে দৈহিক যন্ত্রণা দেওয়া হতো, ভেতরের সিটে মানুষকে বসিয়ে পীড়নযন্ত্রের দরজা বন্ধ করে দিলে শুধু মাথাটাই বের হয়ে থাকে এবং পুরো শরীর মেশিনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সেই লৌহ নির্মিত যন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী ও বাঙ্গালীদের অমানসিক নির্যাতন করা হতো। পীড়ন যন্ত্রের একপাশ পিয়ানো হীনজ বীটস দিয়ে আটকানো। এই পীড়ন যন্ত্রটি চট্ট গ্রামে সার্কিট হাউজে পাওয়া গেছে।

ইয়হিয়া খান ৭১ এর ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে বেলুচিস্থানের কসাই নামে খ্যাত জেনারেল টিক্কা খান কে নিয়োগ দেন। ১৯৬৫ সালে বেলুচিস্থানে রক্তের বন্যা বইয়ে বালুচদের কে নিশ্চিহ্ন করে এই উপাধি পেয়েছিলেন। ৭১ সালে বাংলাদেশে একই ভূমিকা পালন করে ছিলেন বলে, এদেশে তিনি বাংলার কসাই নামে পরিচিত হয়েছিলেন। টিক্কা খান এতোটাই হিংস্র ছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন পূর্ব পাকিস্তান কে ৪৮ ঘন্টায় রক্ত বন্যায় ঠান্ডা করে দেওয়া যাবে। পূর্ব পাকিস্তানে যে, পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ঘটানো হয়েছে তার নিদের্শ প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়ার খানের কাছ থেকে এলেও এর ধারক, বাহক ছিলেন লেঃ জেনাঃ টিক্কা খান। ইয়াহিয়া খান, টিক্কাখান কে এদেশে নিয়োগ দেওয়ার সময় উক্তি করে ছিলেন বিদ্রোহী মানুষ গুলোকে শেষ করে ফেলুন। টিক্কা খান অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রভূভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কুকুরের মতন এ দায়িত্ব ৬ মাস পালন করে গেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার পরিকল্পনা ইয়াহিয়া খান আগের থেকেই গ্রহন করে ছিলেন। ইয়াহিয়া খানের নিদের্শে টিক্কা খানের পরিকল্পনায় হানাদার পাক সৈন্যরা ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালীর রক্তে ভেজালো বাংলাদেশকে। আত্মসর্ম্পনের পর টিক্কা খানের একান্ত সহযোগী মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলীর ড্রয়ারে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল, এর মধ্যে একটা কাগজে লেখা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ কে লালরঙে রাঙিয়ে দিতে হবে। পাকিস্তানীদের সামরিক আগ্রাসন প্রথম পর্যায়ে বেশ দক্ষতার সাথেই চালিত হতে থাকে। যুদ্ধ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় অর্ধেক লোক ঢাকা শূন্য হয়ে পড়ে। প্রথম সপ্তাহে ঢাকাতে বাঙ্গালী মারা গেছে প্রায় ৩০,০০০ হাজার। শুধু ঢাকা শহরেই নয় সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণহত্যা শুরু হয়। পাঞ্জাবী সৈন্যরা ছিল ভীষন নির্মম, নৃশংসতায় এদের জুড়ি মেলা ভার। হত্যায় কখনোই তাদের অরুচি ছিলনা। নানা ধরনের নির্যাতনের মাধ্যমে তারা বাঙালীদের হত্যা করতো। পীড়ন যন্ত্রে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করাও ছিল এর অর্ন্তভূক্ত। পীড়ন যন্ত্রে যে কি নির্মম ভাবে মানুষ কে অত্যাচার করা হাতে তার একটা উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো, চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বন্দী একজন, যিনি ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেছিলেন। তার বর্ণনা নিম্মরুপঃ

"সেদিন ২৭ শে নভেম্বর ৭১ সাল। সন্ধ্যা থেকেই শহরে কারফিউ চলছিল। এমনি দিনে শফিউল আলম নামে একজন বাঙালীকে তার বাসগৃহ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে এবং রশি দিয়ে পেছনে হাত বেঁধে, বদর বাহিনীর নির্যাতন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বদর বাহিনীর নির্যাতন শিবিরে অকথ্য নির্যাতনের পর তাকে সহ কিছু বন্দীদের চোখ হাত বেধে পুনরায় ট্রাকে করে অন্য একটা যায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয় । বর্ণনাদাতা বলছেন চড়াই উৎরাই হয়ে ট্রাকটি যেন কোন এক উচুঁ জায়গায় থামল। এটা সেনা ছাউনি বলে তার মনে হলো, সৈন্যরা উর্দূতে কথা বলছিল। তাদের কথার ফাকে বুঝলাম আমাদের সার্কিট হাউজ ছাউনিতে আনা হয়েছে। হঠাৎ মনটা যেন আতঁকে উঠলো। এখানে ইলেকট্রিক চেয়ারে শক দিয়ে প্রতিদিন মানুষ মারা হচ্ছে । এখানকার গণকবরের ছবি চট্টগ্রামের অনেকে সংগ্রহে রয়েছে। অজ্ঞাত কোন কারণে, পাকবাহিনীর সিদ্ধান্ত এর ফলশ্রুতিতে আকস্মিক

Dhaka University Institutional Repository

এই বন্দীদের টচার্ড মেশিনে না বসিয়ে চট্টগ্রাম কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং দেশ স্বাধীনের পর তারা মুক্তি লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে হারুন অর রশিদ খান নামক জনৈক বাঙালিকে গ্রেফতার করে বদর বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু হারুন ছিলেন অটল, একটি কথাও স্বীকার করেন নাই''[১]।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এই পীড়ন যন্ত্রটি ঢাকা জাদুঘরের পক্ষথেকে জনাব এম, এ, মেসের চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন এবং বর্তমানে এটি মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারীতে প্রদর্শিত রয়েছে''[২]। এই পীড়ন যন্ত্রটি থেকে নিযার্তনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। এই পীড়নযন্ত্রটি স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্ম এবং তার পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

সংগ্রহ নং : ই-৮৬. ৬০৬০

পরিমাপ : ৩ × ৩.৭ (ফুট)

১। মাহফুজুর রহমান, বাঙালি জাতিয়তাবাদী সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম পৃ ৩৭০

২। এই তথ্যবলী প্রদান করেন জাদুঘরের তৎকালীন কর্মকর্তা ড.ফিরোজ মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. আত্নসর্ম্পনের টেবিল

১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার আত্নসর্ম্পনের দলিল স্বাক্ষরিত হয় এই টেবিলে। ১৬ ডিসেম্বর ৭১ লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর আত্নসর্ম্পনে দলিলে স্বাক্ষর করেন। টেবিলটি ১২ মে ১৯৭৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত হয়। টেবিলটি আয়তকার আকৃতির এবং হালকা ফ্রেমের উপর স্থাপিত। টেবিলটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৪০ নং গ্যালারীর দক্ষিন পার্শ্বের দেওয়াল সংলগ্ন মেঝেতে কাঁচের শোকেসে প্রদর্শিত রয়েছে। এর একটু উপরের দেওয়ালে জেনারেল নিয়াজীর আত্নসর্ম্পনের আলোকচিত্রটি প্রদর্শিত রয়েছে। টেবিলটি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নাই, তবে কেহ কেহ মনে করেন যে এটি ঢাকা ক্লাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে ঢাকা ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে জানা যায় যে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন কর্মচারী একজন পদার্থবিদ্যা বিভাগের পিয়ন, অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-আপারেটিভ সোসাইটির সেলসম্যান ১৭ ডিসেম্বর ৭১' সালে মর্নিং ওয়ার্ক করতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা টেবিলটি দেখতে পান এবং এটির সেখান থেকে তারা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

পরবর্তী সময়ে কো-আপারেটিভে চাকুরীরত কর্মচারী তার অফিস কক্ষে টেবিলটি ব্যবহার করতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংক বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর রমজান আলী সরদার বিষয় টি জানতে পারেন এবং ঢাকা জাদুঘরের তৎকালীন কর্মকর্তা ফিরোজ মাহমুদকে এই তথ্যটি অবহিত করেন। ঢাকা জাদুঘরের পরিচালক ড. এনামুল হক বিদেশে থাকায় জাদুঘরের পক্ষ থেকে ফিরোজ মাহমুদ তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদ্বয় টেবিলটি জাদুঘরে প্রদান করতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানান। অনেক চেষ্টা করেও ফিরোজ মাহমুদ যখন রাজী করাতে পারে নাই তখন তিনি প্রফেসার রমজান আলীর স্মরণাপন্ন হন এবং প্রফেসার রমজান আলী দায়িত্ব নিয়ে টেবিলটি উদ্ধার করেন এবং জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তর করেন। ১২ মে ১৯৭৩ তারিখ থেকে টেবিলটি জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে"[১]।

পরিমাপঃ মাটি থেকে উচ্চতা ২৯ সে মি (প্রায়) , দৈর্ঘ্য ৩৫ সে মি (প্রায়)

সংগ্রহ নং ই- ৮৬.৬০৬১

১। টেবিল সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রদান করেন জাদুঘরের তৎকালীন কর্মকর্তা ড. ফিরোজ মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. পতাকা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নং গ্যালারীর দক্ষিন দেওয়ালে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা। বিশাল আয়তনের এই পতাকা টি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কোলকাতায় ১৮ এপ্রিল বেলা ১২ টা ৪১ মিঃ বাংলাদেশ মিশনের তৎকালীন ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী এবং তার সহকর্মী বৃন্দ উদ্বোধন করেন এবং বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গুরুত্ব পূর্ণ সময়ে জনাব হোসেন আলী ও তার বাঙ্গালী সহকর্মীদের আনুগত্য ঘোষনা ছিল অত্যন্ত যুগান্তকারী ও সময়োচিত পদক্ষেপ। তিনি শুধু কোলকাতায় বাংলাদেশ মিশনেরই প্রধান ছিলেন না বরং স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তার সুযোগ্য পরিচালনায় কোলকাতার বাংলাদেশ মিশন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান দূর্গে পরিণত হয়েছিল। কোলকাতা হাইকমিশনে উত্তোলিত এই পতাকাটি জনাব হোসেন আলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার প্রদান করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকে তৎকালীন ঢাকা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরের পরিচালক ডঃ এনামুল হক যুদ্ধকালীন সময়ে লন্ডনে বিচারপতি আবু সা্ঈদ চৌধুরীর সাথে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের কার্যবলীর সাথে সমপৃক্ততা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ডঃ হক বাংলাদেশে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহের বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেন। ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বেশ কয়েকদিন পর ডঃ হক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এই পতাকাটি তৎকালীন ঢাকা জাদুঘর কে উপহার প্রদান করে ছিলেন''[১]। পতাকাটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। সবুজ জমিনের পতাকাটির মধ্যে লাল সূর্য সেই সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের ম্যাপ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বর্তমান পতাকা সবুজের মধ্যে লাল সূর্য কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগ থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছু দিন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পতাকায় মানচিত্র অংকিত ছিল যা বর্তমানে নেই। আমাদের প্রদর্শিত জাতীয় পতাকায় তিনটি রংয়ের সংমিশ্রন ঘটেছে। পতাকার সবুজ রং গ্রাম বাংলার সবুজের কথা বিবৃত হচ্ছে। লাল সূর্যটা আমাদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক মাঝখানের হলুদ ম্যাপটা আমাদের স্বর্ণালী বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। আমরা জানি যে একটা দেশের জাতীয় পতাকা দেশের অস্তিত্বের প্রতীক। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়মাস প্রতিটি স্বাধীনতা কামী পরিবার গোপনে লুকিয়ে স্বযত্নে জাতীয় পতাকাকে তাদের সাথে রেখেছে। পতাকা বাঙ্গালীকে যুদ্ধে যেতে উদ্ধুদ্ধ করেছে। বাঙ্গালীকে অনুপ্রানীত করেছে স্বপ্ন দেখেয়েছে একটা আগামী দিনের প্রতিচ্ছবি।

১৯৭১ সালে ‘‘ঢাকার তেজগাঁয়ে একটি বাসায় ছোট শিশু বাংলাদেশের পতাকা হতে বারান্দায় দাড়িয়ে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়েছিল। তখন সেদিক দিয়ে কিছু পাক আর্মী যাচ্ছিল। সেই শ্লোগান শুনে পাক বাহিনী তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং পতাকার লাঠিটা শিশুটির মাথায় তালুতে ঢুকায়ে দেয়। শিশুটির বাবা দাদাকে দড়ি দিয়ে বেধে রেখে তার মা ও দাদীকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের পর দাদা ও বাবা কে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে’’[২]।

এদিকে ২৭ শে আগষ্ট বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনের বেজওয়াটার এলাকায় নটিংহিল গেটের নিকট ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেন্সে প্রায় তিনশত বাঙ্গালী এবং বহু বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ মিশনের উদ্ধোধন করেন। ভারতের বাইরে লন্ডনেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দূতাবাসের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার পর বিচারপতি চৌধুরী বলেন ‘‘লন্ডন থেকেই বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে এবং লন্ডনই হবে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। লন্ডনে ওয়ার অন ওয়ান্ট এর চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ এর উদ্যোগে ২৪ নং পেমব্রিজ গার্ডেন্সে অবস্থিত হোস্টেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুমগুলো নাম মাত্র ভাড়ায় বাংলাদেশ মিশনকে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

দূতাবাস উদ্ধোধনের পর বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর বিচার প্রতি আবু সাঈদ চৌধুরী তার উদ্ধোধনী ভাষণ দেন। এ

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে বিনা নিমন্ত্রণে বৃটেনের কয়েক গাড়ী বোঝাই করা পুলিশ এবং অফিসার এসে মিশনের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহন করেন। বৃটেনের মাটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই উত্তোলিত পতাকা বাংলাদেশীদের মনোবল বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়।

সংগ্রহ নং ই- ৮৬.৬০৫৯

পরিমাপ ঃ ২৬৪ X ২০৭ সে: মি:

১। ঢাকা জাদুঘরের প্রাক্তন কর্মকর্তা ড. ফিরোজ মাহমুদের দেওয়া তথ্য
২। ডাঃ এম. এ. হাসান, যুদ্ধাপরাধ গনহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ; পৃ- ৮

Dhaka University Institutional Repository

চ.স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের নিদর্শন

কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ ফুটবল দলকে যারা সংগঠিত করেছিলেন তারা হলেন আলী ইমাম, সাইদুর রহমান প্যাটেল, লুৎফর রহমান, আশরাফ আলী চৌধুরী, তানভীর মাযহারুল ইসলাম তান্না প্রমুখ। বাংলাদেশ ফুটবল দল গঠনের পর মুজিবনগর ক্রীড়া সমিতির পক্ষ থেকে, খবরের কাগজ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ফুটবলারদের একত্রিত হওয়ার জন্য বার বার আহ্বান জানানো হয়। এই আহবানে সাড়া দিয়ে আইনুল, কায়কোবাদ, নওশের, এনায়েত, লুৎফর, মাহমুদ, সুভাষ, সুরুজ, সালাউদ্দিন ও মরহুম লালু, ভারতে গমন করেন। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। অধিনায়ক মনোনীত হন জাকারিয়া পিন্টু। অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর এক লেখা থেকে জানা যায়, "নওগাঁ থেকে ৪০ মাইল দূরে বর্ডার পার হয়ে বালুরঘাট চলে যাই। সেখানে সাওঁতাল অধ্যুষিত বাঙ্গালীপুর গ্রামে একটি রিসিপশন ক্যাম্প নামে একটি শিবির খোলা হয়েছে। এই ক্যাম্পটি ছিল ৭নং সেক্টরের আওতাধীন। আমাকে এই ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিছু দিন পর ক্রিকেটার তান্না তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের একটা চিঠি নিয়ে আসেন। চিঠিতে লেখা ছিল, আমাকে কোলকাতায় যেতে হবে এবং একটি মুক্তিযোদ্ধা ফুটবল গঠন হচ্ছে তার দায়িত্ব নিতে হবে। কাল বিলম্ব না করে জনাব তান্নাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে যাই এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রতির সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব খেলোয়ারদের একত্রিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুজিবনগর ক্রিয়া সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সকল খবরের কাগজে এবং স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র থেকে সব খেলোয়াদের আহবান জানিয়েছিলাম"[১]।

জনাব জাকারিয়া পিন্টু আরো জানান যে, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৬ টি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন, এরমধ্যে ১২ টি ম্যাচে বাংলাদেশ দল জয় লাভ করে, তিনটি ম্যাচে হেরে যায় এবং ১ টি ম্যাচ ড্র হয়। প্রতিটি প্রদর্শনী ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত মোট প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা তারা মুজিব নগর সরকারের হাতে তুলে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন। ১৬ টি প্রদর্শনী ম্যাচের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবময় ম্যাচ টি প্রদর্শিত হয়েছিল কৃষ্ণনগরের নদীয়ার মাঠে। ২৪ শে জুলাই ম্যাচটি প্রদর্শিত হয়। ফুটবলার সালউদ্দিন জানিয়েছেন এটাই ছিল তাদের প্রথম ম্যাচ। নদীয়া জেলায় প্রদর্শিত ম্যাচ কে কেন্দ্র করে ব্যাপক গণজাগরনের সৃষ্টি হয়। সমগ্র নদীয়া জেলা জুড়ে এই ম্যাচের পোস্টার লাগানো হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই প্রদর্শনী ম্যাচের বিষয়টি জনগণকে অবহিত করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে উৎসাহী বিপুল সংখ্যক ফুটবল প্রেমিকরা এই প্রদর্শনী ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলো। খেলার শুরুতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। কারণ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো এবং পতাকা উত্তোলন করাকে কেন্দ্র করে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেয় নাই। অবশেষে নদীয়ার জেলা প্রশাসক নিজ দায়িত্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত বাজানো অনুমতি দেন। বাংলাদেশে ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন পিন্টু ও ফুটবলার প্রতাপ দুজন বাংলাদেশের পতাকা হাতে ধরে এবং প্রদর্শনী ম্যাচের বাংলাদেশে দলের অন্যান্য খেলোয়াররা তাদের পেছনে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে দৌড়ায়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন, তখন জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এই খেলার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা স্বীকৃতি ছাড়াই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে, অন্য একটি স্বাধীন দেশের পতাকার সঙ্গে সম-মর্যাদায় উত্তোলিত হয়।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠন প্রসঙ্গে জনাব তানভীর মাযহারুল ইসলাম তান্না জানান যুদ্ধ কালীন সময়ে অস্থায়ী সরকার ভারতে অবস্থিত শরণার্থী ও অন্যান্যদের দৃষ্টি যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে সরিয়ে কিছুটা স্বস্তির জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এর আন্তরিক ইচ্ছায় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গড়ে উড়ে। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফুটবল দল গড়ে উঠে ছিল তারা হলেন জনাব আলী ইমাম, আশরাফ আলী চৌধুরী, সাইদুর রহমান প্যাটেল, লুৎফর রহমান এবং তানভীর মাযহারুল ইসলাম। ফুটবল দল গঠনের পর সব খেলোয়ারদের কে একত্রিত করার জন্য তাদেরকে মুজিব নগরে পাঠানো হয়: তারপর থেকে খেলোয়ারা একত্রিত হতে থাকে। জনাব তান্না দলের ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ পান। জনাব তান্না জানান খেলোয়ারদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে অতিরিক্ত কিছু খেলোয়ার হিসাবে প্রায় ৩০ জন সব সময় থাকতো। এরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

স্বাধীন বাংলার ফুটবল দল সম্পর্কে আলাপকালে ফুটবলার সালাউদ্দিন জানান যে, বাংলাদেশ ফুটবল দল গঠন হওয়ার পর স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকে খেলোয়ারদের একত্রিত হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। এই আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি ভারতে যান এবং ফুটবল দলে যোগাদান করেন। তখন তার বয়স প্রায় ১৮। সালাউদ্দিনের পিতা প্রথমে বিষয়টি রেডিওতে শোনেন এবং তার পুত্রকে অবহিত করেন। সালাউদ্দিন ছদ্মনামে খেলা শুরু করেন। কারণ ৭১ সালে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যারা বিশেষ করে তার পিতা, মাতা, ভাই, বোন সবাই ঢাকা অবস্থান করছিল। পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি তূর্য হাজরা নামে খেলতেন। তিনি আরও জানান যে, কোলকাতায় অবস্থান কালে তাদের জন্য দৈনিক বরাদ্ধ ছিল ১.২৫ টাকা (একটাকা পঁচিশ পয়সা)। মূলত: খাওয়ার পেছনেই এই পয়সা ব্যয় হতো। সকালে তারা নাস্তার বদলে দুপুরের খাওয়া টা একটু আগে খেতো। ভাত, ডাল, আলু ভর্ত্তা বা সবজি এই সবই ছিল তাদের প্রধান খাবার।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত ক্রীড়া সমিতির নিদর্শন গুলো :

১. ই- ৮৬.৬০১৬.১-৪ এলবামঃ ক্রীড়া সংক্রান্ত প্রদর্শনী ম্যাচের আলোক চিত্র সমূহঃ-২
২. ই- ৮৬.৬০১৭- পদকঃ ধাতব
৩. ই- ৮৬.৬০১৮- স্মৃতি ফলকঃ পাথর
৪. ই- ৮৬. ৬০১৯- ফুটবলঃ চামড়ার তৈরী
৫. ই- ৮৬. ৬০২০- জার্সিঃ কাপড়
৬. ই- ৮৬. ৬০২১- এমব্লেমঃ কাপড়
৭. ই- ৮৬. ৬০২২ - এমব্লেমঃ কাপড়
৮. ই- ৮৬.৬০২৩- এমব্লেমঃ কাপড়
৯. ই- ৮৬.৬০২৪- এমব্লেমঃ কাপড়
১০. ই- ৮৬.৫৭৫২ - বঙ্গবন্ধুর আবক্ষঃ প্লাষ্টার অব প্যারিস

Dhaka University Institutional Repository

১. ই- ৮৬. ৬০১৬ঃ .১-.২ -৪ = এ্যালবাম :

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে- ১৯৭১ সালে মুজিব নগর সরকার কর্তৃক গঠিত স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের বিভিন্ন ম্যাচের উল্লেখযোগ্য কিছু আলোক চিত্রের ২ টি এ্যালবাম। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার জনাব তানভীর মাযহারুল ইসলাম তান্না সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল প্রায় ১৬ টি প্রদর্শনী ম্যাচ অংশ গ্রহন করেছিল। ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রদর্শনী ম্যাচ গুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব ম্যাচের সরঞ্জাম গুলো স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর কাছে জমা ছিল। পিন্টু এগুলো ক্রীড়া নিয়ন্ত্রনবোর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কে উপহার প্রদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে ভারতবর্ষে আশ্রয়রত শরণার্থীদের সাময়িক ভাবে হলেও কিছুটা আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শরণার্থীদের মানসিক ভাবে বিপর্যয়ের হাত থেকে কিছুটা প্রশান্তি দিয়েছে। যাদুঘরে প্রদর্শিত এই আলোকচিত্র গুলো আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস ধরে রেখেছে। ছবি গুলো আমাদের খেলোয়ারদের শৌর্যবীর্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন সময় তারা বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করেছে সুন্দর একটা বাংলাদেশের। এই এ্যালবাম গুলোতে খেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। যেমন খেলার শুরু হওয়ার পূর্বে ভারত বর্ষে বিশিস্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বাংলাদেশী ফুটবলারদের কে পরিচয় করানো, খেলা শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশ দলের সব ফুটবলারদের একত্রে দাড়ানো ছবি, খেলার চলাকালীন ছবি, গোলপোষ্টের ছবি, বর্ধমান ও দুর্গাপুরে বিভিন্ন ম্যাচ এর ছবি।

২। স্মৃতিফলকঃ ই- ৮৬.৬০১৮ :

শ্বেত পাথরের তৈরী এই স্মৃতি ফলকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। স্মৃতি ফলকটি আয়তকার আকৃতির। ফলকটিতে এক পার্শ্বে লাল রংয়ের অগ্নিশিখার মনোগ্রামের মধ্যে একজন ফুটবলারের প্রতীক অংকিত। ফুটবলারের বাম পা টি শিখার বাইরে এবং পায়ের কাছে একটা লালরংয়ের ফুটবল। অগ্নিশিখার পাশ ঘেষে লেখা আছে বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি প্রতিষ্ঠা - ১৩ ই জুন ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব নগর। মুজিব নগর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলকের একপাশে লাল অগ্নিশিখার মনোগ্রাম টি যুদ্ধের ভয়বহতা তথা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর রক্তের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রক্তের লাল শিখার মধ্যে একজন ফুটবলার দৃঢ়চিত্তে খেলছে। এটা বাঙ্গালীর দৃঢ়তা, সাহস, শৌর্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। যুদ্ধ কালীন সময় এই সব ফুটবলারগণ পরিবার পরিজন ছেড়ে বিদেশের মাটিতে স্বদেশের পক্ষে বিভিন্ন ম্যাচে অংশ গ্রহন করে এবং জয় লাভ করে। তাদের দৃঢ় মনোবলের কারণেই এ বিজয় সম্ভব হয়েছে।

৩. ফুটবলঃ সংগ্রহ নং ঃ ই- ৮৬.৬০১৯ :

৫ নম্বর ফুটবলটি চামড়ার তৈরী; ফুটবলটিতে সাদা কালো রং দৃশ্যমান তবে এটি অত্যন্ত পুরাতন হয়ে যাওয়ায় কোন কোন স্থানে রং নষ্ট হয়ে গেছে। মুজিবনগর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে গঠিত স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াররা ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বোম্বে, নদীয়া, কোলকাতা, দুর্গাপুর ও বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে ১৬ টি ম্যাচ খেলেছেন এবং এই সব চ্যারিটি ম্যাচ থেকে অর্জিত টাকা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে অস্থায়ী সরকারের হাতে তুলেদেন। বিভিন্ন ম্যাচে অংশ গ্রহণের জন্য ফুটবলাররা একাধিক বল দিয়ে খেলেছে তার মধ্যে জাদুঘরে প্রদর্শিত ফুটবলটি অন্যতম। জাদুঘরে প্রদর্শিত এই বলটি আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মকে বাংলা ক্রীড়া সমিতির গৌরবময় ভূমিকা কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। অস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি আমাদের ফুটবলাররা বিদেশের মাটিতে ফুটবল যুদ্ধে মেতে উঠেছিল। যদিও এসময় তাদের নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে তাদেরকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফুটবলার সালাউদ্দিনও এবিষয়ে এক মত পোষণ করেন। তারা অনেক সমস্যার মধ্যেদিয়ে দিন কাটিয়েছে। ব্যক্তিগত অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য তারা ছিলেন অবিচল। তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল কত দ্রুত দেশ স্বাধীন হবে। সালাউদ্দিন আরোও জানান যে, খেলোয়াররা কখনই তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাকে গুরুত্ব দিতোনা। সবার প্রত্যাশা ছিল দ্রুত স্বাধীন দেশে ফিরে যাওয়ার। এই বলটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের কৃতিত্বকে ধারন করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। বঙ্গবন্ধুর আবক্ষঃ ই- ৮৬. ৫৭৫২ :

প্লাষ্টার অব প্যারিসের তৈরী বঙ্গবন্ধুর অনুকৃতি সম্বলিত আবক্ষ টি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সমিতির পক্ষ থেকে তৈরী করা হয়েছিল বলে জানালেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার জনাব তানভীর ইসলাম (তান্না)। একটি প্রায় ৬ ইঞ্চি উচু বর্গাকার কাঠের বাক্সের উপর আবক্ষ টি বসানো আছে। বাক্সের সম্মুখে পিতলের তৈরী প্লেটে লেখা আছে বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতির প্রতি, নদীয়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের শ্রদ্ধার্ঘ ২৫ জুলাই ১৯৭১, কৃষ্ণনগর পশ্চিমবঙ্গ।

৫। জার্সি ঃ ই- ৮৬.৬০২০ :

প্রদর্শিত জার্সিটি লাল রংয়ের, গোলগলা এবং গলার পাশদিয়ে হলুদ ও সবুজ রংয়ের বর্ডার রয়েছে। জার্সিটির বাম পাশে বুকের উপর সবুজ রংয়ের একটা মনোগ্রাম, এবং মনোগ্রামটির উপর হলুদ সুতার বৃত্তে, হলুদ সুতায় লেখা বাংলাদেশ একাদশ ফুটবল, ১৯৭১-১৯৭২। লাল রংয়ের জার্সিটি মুজিব নগর -এ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সাথে ক্রীড়া সমিতির সদস্যদের একাত্বতা প্রকাশ এখানে স্মরণীয়। তারা শুধু মাঠে নয়, রণাঙ্গনেও ঐক্যরচনা করেছিলেন । জাদুঘরে প্রদর্শিত স্মারক সমূহ শুধু মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি ধরে রেখেছে বললে ভুল হবে। এই নিদর্শন সমূহ মুক্তিযোদ্ধাদের মানে আশার সঞ্চার করেছে। খেলোয়ারদের জোটবদ্ধ হয়ে মাঠে যাওয়া, খেলা অনুশীলন করা ও প্রতিযোগিতায় বিজয় স্বপ্নে বিভোর থাকতো শরণার্থীরা। ক্রীড়া সমিতির এই সংগ্রামী খোলোয়াররা অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন ৭১ রণাঙ্গনে ও মাঠে। এই দুই স্থান দখল ও জয়ী হওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা এই সব তরুণরা তাদের স্মৃতিতে মহান মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে। এ্যালবাম শোভিত হচ্ছে তাদের ফটোগ্রাফ যা তাদের নৈপুন্য, বিজয় গাথার এক উজ্জল সময় কে উপস্থাপন করেছে। এই সব স্মৃতিতে সে দিনে সেই তরুণ খেলোয়ার আজ স্মৃতিভারাক্রান্ত। আগামী প্রজন্মের কাছে এই ক্রীড়া সামগ্রী ও খেলোয়াদের বিজয় কাহিনী মুক্তিযুদ্ধের গৌরব অর্জনের অধ্যায়কে উম্মোচন করবে ।

১। আনোয়ার ফরিদী সম্পাদিত, অতন্ত্র একাত্তর; পৃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

ছ.মাথার খুলি

১৯৭১ এর দীর্ঘ নয় মাস জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল টিককা খান, জেনারেল রাওফরমান আলী এবং জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশ মোতাবেক পাক বাহিনী ঠান্ডা মাথায় বাঙ্গালী নিধনের পৈশাচিকতা ইহুদি হত্যাযজ্ঞের নায়ক আইকম্যানকেও হার মানিয়েছে। জল্লাদ বাহিনী যে কি নির্মম ছিল তা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর কংকাল, খসে পড়া মাথার চুল, হাত পা বাঁধা অবস্থায় বিকৃত লাশ এবং চোখ বাধা অবস্থায় কংকাল দেখলে অনুমান করা সম্ভব। '৭১ এ পুরা বাংলাই ছিল বধ্যভূমি। ২৫ শে মার্চ কাল রাত্রিতে পাক বাহিনী ঢাকা শহরে আক্রমন চালায়। মর্টার আর মেশিন গানের গুলিতে নগর বাসীদের হাহাকার, আর্তনাদ, চিৎকার গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে গণ হত্যার মধ্যে দিয়ে পাক বাহিনী যে হত্যাকান্ড শুরু করে তা বিজয় দিবস পর্যন্ত সাড়া দেশে অব্যাহত ছিল। তেমন গণহত্যার কিছু মাথার খুলি বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশে গণকবর কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নাই। আজ সময়ের ব্যবধানে বহু গণকবর লোক চক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। ''পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তার দোসরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল বাংলাদেশে তার উপর সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ১৮ই ডিসেম্বব ১৯৭১ সালে এক মন্ত্রী সভার বৈঠকে গনহত্যা তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমান স্বদেশে ফেরত আসার পর ১৫ ই জানুয়ারী আওয়ামীলীগ অফিসে দলীয়কর্মীদের এক সমাবেশে গনপরিষদ সদস্য ও কর্মী সমর্থকদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে পাকসেনা ও তার সঙ্গী সাথীদের গনহত্যা, নির্যাতন ধবংসযজ্ঞ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্টি পনেরো দিনের মধ্যে প্রেরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কবি সাংবাদিক সিকান্দার আবু জাফর ১৯৭২ সালে কয়েকটি বধ্যভূমি ঘুরে এসে লিখেছিলেন গ্রামে গ্রামে বধ্যভূমি তার নাম আজ বাংলাদেশ''[১]। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অগনিত বধ্যভূমির মধ্যে কয়েকটি বধ্যভূমির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। ১৯ শে জানুয়ারী ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমিঃ শিক্ষক শ্রমিক ছাত্র কিষান কিষানীর অতলান্ত সেই রক্ত স্রোত।

১। সুকুমার বিশ্বাসঃ বাংলাদেশে; মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস, পৃষ্ঠা নং- ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলায় ঢাকার রমনা পার্কের বধ্যভূমির উপর রিপোর্ট করা হয়। খবরে প্রকাশ রমনা পার্কের বধ্যভূমিঃ ক্ষয়ে যাওয়া পোষাক দেখে কি তাদের শনাক্ত করা যাবে? ১৯৭২ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারী দৈনিক বাংলায় প্রকাশ, আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়াঃ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী এখানে কয়েক হাজার লোক হত্যা করেছে। ৬ ই ফেব্রুয়ারী ৭২ এ পূর্বদেশে প্রকাশ, হাজার প্রানের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী। খবরে প্রকাশ লাকসাম জংশনের দক্ষিন পশ্চিম কোনে এই সিগারেট ফ্যাক্টরীটি লাকসামবাসীর নিকট হত্যাপুরী নামে পরিচিত। স্বাধীনতার নয় মাসে এ ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন কোনায় বাক্সে ও ছাদে নির্বিচারে গন হত্যা চলেছিল তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ৭ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলায় প্রকাশ চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা, জ্যান্ত মানুষ গুলোকে হাত পা বেঁধে গায়ে সিগারেটের আগুন দেওয়া হতো চোখ তুলে নেওয়া হতো দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হতো। খবরে প্রকাশ মেঘনা তীরবর্তী চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল খুনীদের কসাই খানা। একবার কাউকে সেখানে নিয়ে গেলে আর কোন দিন খোঁজ পাওয়া যেতনা। এই এলাকাটি ছিল চাঁদপুর বাসীর নিকট অত্যন্ত আতংকের স্থান। ১২ ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক বাংলার প্রকাশ খুলনায় পাকবাহিনীর নরমেধযজ্ঞ। ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে দৈনিক আজাদে প্রকাশ নরহত্যা অগ্নিকান্ড ও ধবংসযজ্ঞ ছিল ওদের কাজ। ঢাকা শহরেও ছিল অগনিত বধ্যভূমি; তার মধ্যে কয়েকটি বধ্যভূমি, কথা উল্লেখ করা হলো, যেমন রায়ের বাজার বধ্যভূমি, রাজার বাগ পুলিশ ফাড়ী, জগন্নাথ হল বধ্যভূমি প্রভৃতি। ঢাকার মিরপুর এলাকার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই ছিল বধ্যভূমি। যেমন শিয়ালবাড়ী, মুসলিম বাজার, জল্লাদ খানা, বাংলা কলেজের পেছনে বধ্যভূমি এবং হরিরামপুরের বধ্যভূমি ইত্যাদি। ‘‘হরিরামপুরের গোরস্থান এর পূর্বে অবস্থিত একটা গর্ত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক ও এক জন ডাক্তার এবং অপর একটি গর্ত থেকে তিনজন শিক্ষকের গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রথম গর্ত থেকে যাদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষনা ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ডঃ সিরাজুল হক খান, ন আ ম ফয়জুল মাহী ও ইতিহাস বিভাগের সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজার লাশ, অপর গর্ত থেকে উদ্ধার কারী শিক্ষক বৃন্দ লাশ গুলো ছিল ইতিহাস বিভাগের ড. এম. এ খায়ের, ইংরেজী বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

রাশীদুল হাসান এবং বাংলা বিভাগের মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। শহীদদের আত্মীয় স্বজন এসে তাদের লাশ শনাক্ত করেন[২]"।

"৪ঠা জানুয়ারী এই বধ্যভুমিতে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে এই অভিযানে অংশ গ্রহন করেছিলেন মিত্র বাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্য বৃন্দ। ৬ ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সহ বিপুল সংখ্যক ছাত্র শিক্ষক এতে অংশ গ্রহন করেন। মস্‌জিদ প্রাঙ্গনেই শহীদদের লাশ দাফন করা হয়। সন্তোষ ভট্টাচার্যের গলিত লাশ শ্যামপুর শ্মশান ঘাটে দাহ করা হয়"[৩]। ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারী ওয়াশিংটন পোষ্টের সাংবাদিক লুইস এম সাইমনস গিয়েছিলেন ঢাকার অদূরে হরিহর পাড়া গ্রামে। পাক বাহিনী এই গ্রামের প্রায় ২০ হাজার নির্দোষ বাঙ্গালীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। ওয়াশিংটন পোষ্টের সাংবাদিকের গ্রাম থেকে পাঠানো সংবাদে আরো উল্লেখ করেছিলেন কেবল হরিহর পাড়া গ্রাম বাসীদেরকেই এভাবে হত্যা করা হয়নি বরং অন্যান্য গ্রাম, নারায়নগঞ্জ ও ঢাকা থেকে অসংখ্য মানুষ কে ধরে এনে বুড়িগঙ্গার তীরে এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হতো।

১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর আবিস্কৃত হয় রায়ের বাজার বধ্যভূমি। সেখান থেকে উদ্ধারকৃত বেশীর ভাগ লাশই শানাক্ত করা যায় নি। কারণ ওগুলো ছিল বিকৃত। তবে যাদের শনাক্ত করা গেছে তারা হলেন অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, বেগম সেলিনা পারভীন, ডাঃ ফজলে রাব্বী ও আরো কয়েকজন। তেমনি কিছু বধ্যভূমি থেকে সংগৃহীত মাথার খুলি বাংলাদেশে জাতীয় যাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

জাদুঘরে প্রদর্শিত এই মাথার খুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় একাত্তরের গনহত্যার কথা, ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী রক্ত ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের কথা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এদেশের ইতিহাসের ধারক ও বাহক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কে মানুষের মধ্যে সদা জাগ্রত রাখা এবং আমাদের আগামী প্রজন্মকে স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধের গ্যালারীতে এই মাথারখুলি গুলো প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পাক বাহিনীর নির্মমতার

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস ও যেন মানুষ ভূলে না যায়, মানুষের মধ্যে যেন দেশ প্রেম জাগ্রত থাকে সেই লক্ষ্যে জাতীয় জাদুঘর খুলিগুলো প্রদর্শন করে আসছে।

"জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহের যে পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেল তারই ফলশ্রুতিতে মাথার খুলি গুলো জাদুঘরের পক্ষে সংগ্রহ করা হয় এবং তা পরবর্তীতে সংগ্রহ ভূক্তিকরণ করা হয়েছে। তৎকালীন ঢাকা যাদুঘর কতৃপক্ষ স্বাধীনতা সূচনা লগ্ন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহ শুরু করে। নিদর্শন সংগ্রহের জন্য দু জনকে ঢাকা যাদুঘর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দান করেছিলেন।

১। জনাব শফিকুল আজগর - যাকে পূর্ববঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন স্থানে নিদর্শন সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পন করা হয় এবং

২। জনাব মেসের কে উত্তর বঙ্গ তথা বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জনাব মেসের উত্তর বঙ্গ থেকে মাথার খুলি গুলো সংগ্রহ করে আনেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারীতে মাট ১২ (বার) টি মাথার খুলি প্রদর্শন করা হচেছ। খুলিগুলো জাদুঘরের সংগ্রহ ভুক্ত নিদর্শন। এই বারটি খুলির জাদুঘর সংগ্রহ নম্বর ই ৮৬.৫৬৬১ থেকে ই - ৮৬. ৫৬৭২ পর্যন্ত। এই বার জন বাঙ্গালীকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছিল তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে একটি খুলির চোখের কাছে গুলির চিহ্ন লক্ষনীয়"[৪]।

এই খুলিটির ডানদিকের চোখের নিচে অনেকটা ভাঙ্গা। এই বার টি মাথার খুলি থেকে পাকিস্তান সেনা বাহিনী ও তার দোসরদের নির্মমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ খুলি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মনে রাখতে সহায়তা করবে।

২। সুকুমার বিশ্বাস: বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস; পৃষ্ঠা নং -৯৪
৩। ঐ পৃষ্ঠা নং- ৯৪
৪। জাদুঘরের প্রাক্তন অফিসার ডঃ ফিরোজ মাহমুদের দেওয়া তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

জ. শহীদ মিনারের ভগ্নাংশ

শহীদ মিনার বাঙ্গালী জাতির অধিকার আদায়ের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে। বাঙ্গালীরা বিভিন্ন সময়ে শহীদ মিনারের পাদদেশে এসে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছে। আজও বাঙ্গালী তাদের দাবী দাওয়া আদায়ের আন্দোলন শহীদ মিনার থেকে শুরু করে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ এসময়ের সব আন্দোলনই শহীদ মিনার জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। বাঙ্গালী জাতির সেই তীর্থ স্থান শহীদ মিনারকে ধবংস করেছে হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ রাতে। পাকসেনাদের ধারনা ছিল শহীদ মিনার ধবংস করে দিলে বাঙ্গালীর জাতিসত্ত্বা লোপ পাবে, বাঙ্গালী তার ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে ভুলে যাবে। বাঙ্গালী জাতী আর ক্ষিপ্ত গতিতে আন্দোলন চালাতে পারবে না। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে এমনভাবে ভীত করে তুলেছিল যে শহীদ মিনারকে ধবংস না করা পর্যন্ত তারা দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারছিল না। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। শুরু করে ছিল ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর হত্যাযজ্ঞ। এমন গণহত্যা ও নিধনপর্বের এক পর্যায়ে ধবংস করে শহীদ মিনারকে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে তৎকালীন ঢাকা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ধবংস প্রাপ্ত শহীদ মিনারের পিলারগুলোকে জাদুঘরে সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই পিলারগুলো জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য নিয়ে আসেন। শহীদ মিনারের সম্পূর্ণ ধবংস প্রাপ্ত ভগ্নাংশগুলো জাদুঘরের রিজার্ভ সংগ্রহে রয়েছে এবং এর একটি পিলার জাদুঘরের ৩৯ নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। জাতীয় জাদুঘরে এই পিলারগুলো রাখার উদ্দেশ্যে হলো

প্রথমত : ১৯৭১ সালে ধবংস প্রাপ্ত শহীদ মিনারের পিলারগুলো জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

দ্বিতীয়ত : ভাষা আন্দোলন এবং শহীদ মিনারের ইতিহাসের সাথে ভবিষৎ প্রজন্মকে পরিচিত করে তোলা।

তৃতীয়ত : পাকবাহিনীর ধবংস যজ্ঞের নমুনা হিসাবে এই পিলার সাক্ষ্য বহন করছে।

জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মূলত উপরোক্ত কারণেই পিলারগুলোর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। "এতবড় ভারী ভারী পিলারগুলো জাদুঘরে আনা অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ কাজ। তাই এই কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অফিসিয়াল প্রথা অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

টেন্ডার আহবান করা হয়। সর্বনিম্ন টেন্ডার দাতা ৩০০০ টাকায় কাজটি পেয়ে যান। এই প্রক্রিয়াতে পিলারগুলো জাদুঘরে আনা হয়"[১]। এরই মধ্যে একটি পিলার ৩৯নং গ্যালারীর মেঝেতে প্রদর্শিত হচ্ছে। ইট লোহা বালু সিমেন্ট ইত্যাদি মিশ্রণে পিলারগুলো তৈরী করা হয়েছে; ভগ্ন পিলারটির লোহা বের হয়ে আছে।

পরিমাপঃ - ১৭১ সেঃ মিঃ

সংগ্রহ নং- ই- ৮৬.৬০৬৩

১। শহীদ মিনারের ভংগ্নাশ বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন জাদুঘরের তৎকালীন কর্মকর্তা ড. ফিরোজ মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ক. জাদুঘরে সংরক্ষিত লিখিত নিদর্শন : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

পোস্টার শব্দটি ইংরেজি ভাষা হলেও এটি বর্তমানে প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে প্রচারপত্র বা ইশতিহার টাঙ্গিয়ে কোন কিছু প্রচার করাকে পোস্টার বলে। পোস্টার প্রচার- কেন্দ্রিক একটি মুদ্রিত বা লিখিত শিল্প মাধ্যম। সাম্প্রতিককালে ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে পোস্টারের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৭১ - এর স্বাধীনতা যুদ্ধেও পোস্টারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে সহায়তা করেছে পোস্টার। এতে বাঙ্গালির হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংঙ্খার প্রতিফলনও ঘটেছে। নিষ্ঠুর গণহত্যা আর দুঃসহ অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালিকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে কতগুলো পোস্টার ছাপা হয়েছিল তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এ ধরনের কিছু পোস্টার সংগ্রহ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের এসব পোস্টার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পীপ্রাণেশ মন্ডলের সাথে আলাপে জানা যায় যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিব নগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর্ট সেকশনে ছয় জন শিল্পী ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরা হলেন কামরুল হাসান পরিচালক, শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, প্রাণেশ মন্ডল, নাসির বিশ্বাস এবং বীরেন সোম। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রায় সকল কাজ তাদের মাধমে সম্পাদিত হতো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সমাজের অন্যান্য শ্রেনীর মতো চিত্রশিল্পীদের ভূমিকাও ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁদের অনুপ্রেরণামূলক চিত্রকর্ম দেশবাসীকে সাহস যুগিয়েছে।

নিম্মে কয়েকটি পোস্টার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

এটি একটি প্রতীকধর্মী পোস্টার। শিল্পী কামরুল হাসানের বিখ্যাত শিল্পকর্ম এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে, এটি বহুল প্রচলিত পোস্টার হিসাবে সমাদৃত। পোস্টারটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত। পোস্টারটিতে ঘাতক ইয়াহিয়া খানের একটি বিভৎস কদাকার প্রতিকৃতি অংকিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের ক্ষোভ হিসাবে বাঙ্গালিদের মনে ইয়াহিয়ার প্রতি যে, ঘৃণা জম্মে ছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই পোস্টারে।

২৫শে মার্চ ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায় আসা থেকে শুরু করে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরীর কাল বলা যেতে পারে। ক্ষমতায় আসা প্রসঙ্গে যদিও তিনি বলেছিলেন "I Openly admit that I welcomed the chance to take away power from Ayub. I knew that if any army commander would restore civil rule it would be myself. I took power because I trusted myself. I did not know any army General more democratic then myself"[1]

কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ইয়াহিয়া খানের দু'বছর শাসন কালের মধ্যে বহুবার গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁর মধ্যে অসংগতি ছিল প্রচুর। আসলে তিনি ততটুকু গণতন্ত্র চেয়েছিলেন, যতটুকু দেওয়া যায় বলে মনে করতেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রশ্নে নীরব ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেন নাই। তিনি প্রভিশনাল লিগ্যাল ফ্রেমওর্য়াক এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; লিগ্যাল ফ্রেমঅর্ডার জারির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ৬ দফা কর্মসূচী যেন বাস্তবায়ন না হতে পারে। ১২ নভেম্বর'৭০ এর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলের উপর দিয়ে এক প্রলংকর ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সময়ে দূর্গত মানুষের পাশে এসে দাড়ায় নাই; এমন কি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত না।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৩ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে নব নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন। নির্বাচনের পর জানুয়ারী ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিব কে জানান যে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ফেব্রুয়ারীর আগে সংসদের অধিবেশন ডাকা যাবে না।

১। মুনতাসীর মামুন : ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ- পৃ : ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ভাষায় "I must say that, this was not a sincere stand although its logic could not be faulted"[2] এভাবেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। '৭১ এ জানুয়ারী থেকেই ইয়াহিয়া খান ঠিক করেছিলেন, বেসরকারী আন্দোলন দমনে সেনাবাহিনী ব্যবহার করা হবে। ঢাকা থেকে সরাসরি তিনি লারকানায় ভূট্টোর সঙ্গে দেখা করতে যান; এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে বাঙ্গালীদের দমন করা যায়, সে ব্যাপারে জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করা।

এরপর ২৭ শে জানুয়ারী '৭১ ভূট্টো ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারী এক সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ '৭১ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারী জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদিতে অস্বীকৃতি জানান। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ১ মার্চ '৭১ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে ২ ও ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ২রা মার্চ রাতে কারফিউ জারী করার ফলশ্রুতিতে ছাত্র জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হলে সেনাবাহিনী গুলি চালায়। এদিকে ইয়াহিয়া খান ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে পি আই এ বিমান যোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় সৈন্য পাঠাতে শুরু করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এধারা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। ৬ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খান কে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করে কঠোর হাতে আন্দোলন প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের এক বিশাল জনসমূদ্রে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সাড়া বাংলায় এই ভাষণ টি স্বাধীনতার সবুজ সংকেত হিসাবে পরিগণিত হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ এক বৈঠকে ১২ জন নেতাকে আমন্ত্রণ জানালে বঙ্গবন্ধু এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। ১৫ মার্চ কঠোর সামরিক প্রহরায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জেনারেল হামিদ, জেনারেল খোদাদাদ খান, জেনারেল মিঠ্ঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, প্রমূখ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ মার্চ ৭১ থেকে ২০ মার্চ '৭১ পর্যন্ত কয়েক দফায় দুপক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক সম্পন্ন হয় কিন্তু এতে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। ২১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জনাব ভূট্টোর এক গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষে ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সাথে ডঃ কামাল হোসেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এর আনুষ্ঠানিক বৈঠক সম্পন্ন হয়। কিন্তু এটি ছিল নিষ্ফল বৈঠক।

অতঃপর ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান অপারেশন 'সার্চলাইট' এর নির্দেশ দিয়ে গোপনে সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করেন। পূর্বপাকিস্তানের জনগণের প্রতি ইয়াহিয়া খানের বৈরী মনোভাবের প্রেক্ষিতে শিল্পী কামরুল হাসান এই শিল্পকর্মটি এঁকেছেন। পোস্টার টি বিশ্ববিবেককে এতটাই জাগ্রত করেছিল যে, বিশ্বব্যাপী ইয়াহিয়া খান অত্যন্ত নিগৃহীত হয়েছিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরতা সমগ্র বিশ্বে প্রচার হয়েছে। পোস্টারটিতে লাল ও কালো রং এর ব্যবহৃত হয়েছে। পোস্টারটির পরিমাপ ৭১×৫১ সেন্টিমিটার।

এটি বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২। বাংলারহিন্দু, বাংলারখৃষ্টান, বাংলারবৌদ্ধ, বাংলারমুসলমান, আমরা সবাই বাঙ্গালী :

এই পোস্টারটিতে বাঙ্গালীর অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, সব ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল পোস্টারটির মূলমন্ত্র। কালো ও কমলা রঙয়ের সমন্বয়ে পোস্টারটি মুদ্রিত। "১৯৬১ সালে আদমশুমারীর রির্পোটে দেখা যায় পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০.৪, হিন্দু ১৮.৫ এবং অন্যান্য ধর্মের লোক সংখ্যা ছিল ১.১ কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় শতকরা ৮৫.৪ ভাগ মুসলমান, হিন্দু শতকরা ১৩.৫ এবং অন্যান্য ধর্মের লোক ছিল ১.১ ভাগ"[৩]। পোস্টারটিতে মসজিদ, মন্দির প্যাগোডা ও গীর্জার স্থাপত্যশৈলীকে মোটিফ হিসাবে শিল্পীর তুলিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। পোস্টারটি একেঁছিলেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী।

পোস্টারটির পরিমাপ ৭১ × ৮৪.৫০ সেন্টিমিটার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উল্লেখ্য যে, এই সব পোস্টার গুলো পরবর্তীকালে আবার পুনরায় মুদ্রণ করা হয়েছে।

৩। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম :

‘‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দিব’’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি মূলত স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য একটি সবুজ সংকেত। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালীদের স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। বাঙ্গালী কিভাবে এগিয়ে যাবে, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে তাও তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

যে কয়েকটি ভাষণ সারা পৃথিবীতে এ যাবৎকালে বিশেষ ভাবে আলোচিত তার মধ্যে এটি অন্যতম। পন্ডিতগণ মনে করেন যে, ‘‘বঙ্গবন্ধু ৭ ই মার্চের ভাষণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন -এর গ্যাটিসবার্গ এ্যাড্রেসের সমতুল্য বা এর চেয়েও বেশি কিছু। তবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অলিখিত অর লিংকনের ভাষণটি ছিল লিখিত’’[৪]। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা । বঙ্গবন্ধু তর্জনি উচিয়ে রাখা প্রতিকৃতি সম্বলিত পোস্টারটিতে তিনটি রংয়ের সমারোহ ঘটেছে। সাদা, কালো ও লাল, বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মরণে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে কালোর মাধ্যমে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জানানো হয়েছে লাল রংয়ের মাধ্যমে এবং আগামীতে শান্তির প্রত্যাশা সাদাতে।

পোস্টারটির পরিমাপ ৭২ × ৫১ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২। ঐ, পৃ - ৯৮

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান রির্পোট ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৪। বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা :

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও অকাতরে যুদ্ধ করেছে। নিয়েছে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ। দুই লক্ষ মা বোন হয়েছে লাঞ্ছিত। লক্ষ লক্ষ মা তাদের সন্তানকে, বোন ভাইকে ঠেলে দিয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। বাঙ্গালী নারীর কোমল হাতে উঠে এসেছিল রাইফেল, স্টেনগান। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও নারী অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে তথ্য আদান প্রদান করেছে, সাংস্কৃতিক দল, মেডিক্যাল টিম ও ক্যাম্পে ক্যাম্পে সেবার কাজ করেছে। “২৫ শে মার্চ রাতে রোকেয়া হলের ছাত্রী রওশন আরা একটি তাজা মাইন পেটে বেঁধে নিয়ে পাকবাহিনীর কনভয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইতিহাসে রওশন আরা উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন । তিনি প্রমান করে গেছেন বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে তিনিও একজন”[৫]। “চট্টগ্রামে করের হাটের এক যুদ্ধে শেলের টুকরো এক বালকের পেটে বিদ্ধ করে বালকটিকে দুভাগ করে ফেলে। তার পাশে একজন বৃদ্ধা কাঁপা কাঁপা দুটি হাতে সর্বশক্তিমানের কাছে ফরিয়াদ জানায়, আল্লাহ আমার ছেলেকে তুমি নিয়ে গেছো, সেই ছেলের জন্য আমার কোন নালিশ নাই। কিন্তু দেশের জন্য আমার যে সব ছেলে যুদ্ধ করছে তুমি তাদের সাহায্য কর”[৬]। এই বাঙ্গালী মা যে কত বড় মুক্তিযোদ্ধা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তারামন বিবি, ডা. সিতারার মত ‘‘বীর প্রতীক’’ খেতার প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। পোস্টারটিতে রাইফেল হাতে এক বাঙালি রমনীর আবক্ষ প্রতিকৃতি। এই নারীর চোখে মুক্ত স্বাধীন দেশের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। নারীরাও যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিল তাদের ভূমিকার কথা এতে স্বীকৃত হয়েছে। অতি নৈপুন্যের সাথে এক রং পোস্টারটি মুদ্রিত হয়েছে। পোস্টারটি এঁকেছেন শিল্পী নিতুন কুন্ডু।

পোস্টারটির পরিমাপ ৭২ ×৫০ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫। বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা :

এই পোষ্টারটি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধিত্বমূলক পোস্টার। সাড়েসাত কোটি বাঙালির প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার স্বাধীনতা এসেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে অন্যান্য শ্রেনীর মতো কৃষক শ্রেণীরও ছিল যথেষ্ঠ আন্তরিকতা। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কৃষকেরা অস্ত্র ধরেছে আবার শহর থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, অন্নের সংস্থান করেছে। কৃষিকাজের পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধে, কখনও সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকের হাতেও উঠে এসেছিল অস্ত্র। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রনী ভূমিকা ছিল ছাত্র-যুবক সমাজের। যেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন Urdu would be the state language in Pakistan সেদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সোচচার হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ছাত্র সমাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণে। এ আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ। ৬৯ এ গণঅভ্যূত্থানে নিহত আসাদ মতিউর ছিলেন ছাত্র। ৭১-এর স্বাধীনতার পটভূমিতেও সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন এরা। তৎকালীন ছাত্র নেতাদের প্রচেষ্টায় প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক তাদের প্রাণকে বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। এই পোস্টারটি লাল ও সবুজে ছাপা হয়েছে। এখানে সবুজ রংটি প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশের, আর লাল রঙের মাধ্যমে সংগ্রামের চেতনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

পোস্টারটির অংকন শিল্পী প্রাণেশ মন্ডল।

পোস্টারটির পরিমাপ ৫০ × ৪৬ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬। রক্তের ধার রক্তে শুধাবো, দেশকে এবার মুক্ত করবোঃ

ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মহুতির ফল আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে রাঙা বাংলাদেশ পৃথিবীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। বীর বাঙালি মরণকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। এখানে ছিলোনা ধনী-গরীব, অশিক্ষিত-শিক্ষিত বা নারী-পুরুষের ভেদাভেদ। বাংলার লাখো সোনার ছেলের মত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ছিলেন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে পালিয়ে জুলাই-এ

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ১১ নং সেক্টরের জামালপুর জেলার কামালপুরে যুদ্ধ করছিলেন।

''৩১ শে জুলাই শেষ রাত থেকে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। বৃষ্টির মত গুলি চলছিল। সালাউদ্দিন ম্যাগাফোনে সহযোদ্ধাদের সতর্ক করার সময় তার সামনে ২/৩ বোমা এসে পড়ে। সাথে সাথে সালাউদ্দিন ভূমিতে লুটায়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা কাছে এসে তাঁকে কলেমা পড়তে বলায়, তিনি বলেন আমার কলেমা পড়ার দরকার নাই। খোদার কসম তোরা যে পেছনে হটবি আমি তাঁকে গুলি করবো। মরতে হয়, ওদের কে মেরে মরব, বাংলার মাটিতে মরবো''[৭]। সালাউদ্দিন নিজের রক্ত দিয়ে ঋণ শোধ করে গেছেন। সহযোদ্ধাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে গেছেন। দুই রঙে মুদ্রিত পোস্টারটিতে দেখা যাচ্ছে নারী পুরুষ যুবক সবার হাতে রাইফেল। সবার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। প্রয়োজনে আরও রক্ত দেব কিন্তু স্বাধীনতা চা-ই চাই, এটাই এই পোষ্টারের মূল বক্তব্য।

পোস্টারটির পরিমাপ ৭১×৪৬ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতার থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭। Help Bangladesh:

এই পোস্টারটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এদেশীয় এবং বিশেষ করে ভারতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। এই আহবানে সারা দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য বন্ধু প্রতীম দেশের মতন বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য আর্জেন্টিনার বুদ্ধিজীবী মহলও এগিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ে একটি তথ্য বাংলাদেশ ডকুমেন্টস এ প্রকাশিত হয়।

তথ্যটি নিম্ন রুপঃ

"A delegation representing well known Aregentine intellectuals called on the Argentine Foreing Minister.Mr Luis Maria de Pablo pardo on june 11 1971, and presented a Memorandum requsting urgent relief assistance to the East Bangal refugees who have Come to India. The memorandum was signed by leading Argentine writers academicians, painters, Jurists, and other intellectuals of national and international standing including the eminent

Dhaka University Institutional Repository

authors Madame Victoria Ocampo and Jorge Luis Berges and the Reverend Father Ismael Quiles, Vice-chancellor of EI Salvador University.

Following is the text of the memorandum, which was prominently published, in the Argentine press:

As a result of the recent tragic events in East Bengal, an enormous number of people-men, women and children have fled the country to neighbouring India creating a human problem. Loyal to her own traditions. India dedicated as she is to peace, co-existence and spreading of understanding among.

Refugees is struggling hard to food clothes and shelter these unfortunate refugees who are said to be already four million. The task is, however, of such a magnitude that India cannot be expected to shoulder this alone particularly when she is fully engaged in her own nation building efforts"[8].

১৯৭১ এ পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আমেরিকার বুদ্ধিজবী মহল আবেদন জানিয়েছিলেন।

খবরে প্রকাশ :

AMERICAN ACADEMIC COMMUNITY'S APPEAL TO PRESIDENT NIXON TO WITHDRAN U.S. SUPPORT FROM PAKISTAN: NOV, 12-1971

"Following is the appeal form hundreds of members of the American academic community in more than twenty Universities across the country;

Singers included Nobleprize winners Paul Samuelson and Salvador Luria of M.I.T. and Simon kuznetz of Harvard. Major academic specialists Gabriel Almond (Stanford) James Tobin (Yale), Talcoll parsons, Wassily Leontief, Ralph Retzlaff (Berkiley) and anothers" [9].

৪। ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে (১৯৯৭ সালে) ৭ই মার্চ এর ভাষণের আলোচনায় এই তথ্য দিয়েছিলেন।

৫। মুহাম্মদ নুরুল কাদির, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, পৃ. ৮১

৬। রফিকুল ইসলাম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পৃঃ ৫২

Dhaka University Institutional Repository

৮। Bangladesh Needs Your Help :

নিষ্পাপ অসহায় এক শিশু। তার দুগালে দুফোটা অশ্রু। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানহীন অনাথ শিশুটি বাংলার লক্ষ লক্ষ অসহায় শিশুর প্রতিনিধি করছে। চোখে তার উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার ছাপ। অসহায় শিশু জানেনা কোথায় বাবা মা, আত্মীয় পরিজন। শিশু অধিকার লঙঘন করা মানবতাবিরোধী কিন্তু হানাদার বাহিনী সেসব অধিকার হরণ করে নির্বিচারে শিশু হত্যা করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বেয়োনেটের খোঁচা দিয়ে শিশুদের হত্যা করতে। নিষ্পাপ অসহায় ফুলের মত শিশুদের ওপর দিকে ছুড়ে মেরে পেটের ভেতর বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করা ছিল তাদের এক নিষ্ঠুর খেলা। ইয়াহিয়া ও তার বাহিনীর অপকর্মে সমগ্র বিশ্ব যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

ভারতীয় শরণার্থী শিবিরগুলোতে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশগত কারণে মহামারী, ডায়রিয়া, কলেরা, রক্ত আমাশয়ের প্রাদুর্ভাবে অনেক শিশুই মারা যায়। আন্তর্জাতিক রেডক্রস যখন আর্তের সেবায় এগিয়ে আসতে চেয়েছিল, তখন ইয়াহিয়া খানের ভাষ্য ছিল পূর্বপাকিস্তানে কোন আর্ত নাই এবং আর্তের সেবার প্রয়োজনও নাই। এই পোস্টারের শিশুটি মুক্তিযুদ্ধে অসহায় শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর্থিক ও মানবিক সাহায্যের পাশাপাশি বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করাই ছিল পোস্টারটির উদ্দেশ্য। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা ছিল :

Send Your Donations to Bangladesh Assistance Committee, Himalaya House, Curzon Road, New Delhi-1 (Phone 40522)

পোস্টারটির পরিমাপ ৭১ × ৪৬ সেন্টিমিটার।

৯। মোদের গরব মোদের আশা আ'মরি বাংলা ভাষা :

বাংলা ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর এক অনন্য বিরল ঘটনা। কারণ ভাষার জন্য এ জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপন হয়েছিল এই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। যেদিন পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সেই দিন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বাংলার আপামোট জনসাধারণ। বাঙালী সেদিনই বুঝতে পেরেছিল দুই জাতির একত্রিত থাকা সম্ভব নয়। এই ভাষাকে কেন্দ্র করে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় সে-থেকেই আস্তে আস্তে রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তিত হতে থাকে। যার ফল ৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালির মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি করাই ছিল পোস্টারটির লক্ষ্য। দু'টি রঙয়ের ব্যবহার হয়েছে পোস্টারটিতে, চকলেট ও হালকা সবুজ।

পোস্টারটির পরিমাপ ৫০ X৩৮ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে পোস্টারটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০। এক একটি বাংলা অক্ষর অ-আ ক-খ/ এক একটি বাঙালীর জীবন:

যে দিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সেদিনই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বাংলার মাটি। পরবর্তীকালে পার্লামেন্টে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংগঠিত করার দাবি ও আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের সামনে গুলি চালায়। অনেক ছাত্র জনতা আহত হয়, শহীদ হন অনেকে। উল্লেখ্য যে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা নেওয়া হয়। অপরদিকে সরকার ২০ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে। ঢাকায় ২১ শে র কর্মসূচীর দায়িত্ব ছাত্ররাই নিয়ন্ত্রণ করছিল। বেলা তিনটার দিকে আইন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীবর্গ মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে এগোতে থাকেন। ছাত্ররা শ্লোগান দিতে থাকে এক পর্যায়ে পুলিশ মেডিকেল কলেজের সামনে ও হোস্টেলে গিয়ে গুলি চালালে সালাম,শফিক, রফিক, বরকত, জব্বার নিহত হন। ভাষার জন্য রক্তদান পৃথিবীতে এক বিরল ঘটনা। বাঙালি রক্ত দিয়ে প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছে। লাল ও সবুজ রঙয়ের সমন্বয়ে পোস্টারটি মুদ্রিত। - অংকন শিল্পী প্রাণেশ মন্ডল। পোস্টারটির পরিমাপ ৫০ X৩৫.৫০ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতার থেকে এটি প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

১১। বাংলার প্রাণ/ একমুঠো ধান/ ফলানোর এক নাম স্বাধীনতা সংগ্রাম :

স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল অসীম। জীবনের চাওয়া পাওয়ার প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না, ছিলোনা উচ্চভিলাষের মিথ্যা গর্ব। তারা ছিল আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণ। যারা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঠান্ডা করে দিতে চেয়েছিল বাঙালিকে, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল বাঙালি জাতিকে, যারা পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করে শুধু মাটি চেয়েছিল। মানুষকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল, Kill Bangalees, rape their women, burn their house and loot their Valuables. তাদের বিরুদ্ধে সোচচার হয়েছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী। বাংলার কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী ছাত্র জনতা নারী শিশু সবাই। বাংলার কৃষকের ফলনের হাতে অস্ত্র উঠে এসেছিল। বাংলার জনগণকে বাঁচাবার এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার ছিল বাংলার বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক ছাত্র জনতা, নারী, শিশু সবাই।

পরিমাপ : ৫০ × ৩৮ সে:মি

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে এটি প্রকাশিত

১২। পোস্টারঃ The Concert for Bangladesh :

মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে ১৯৭১ সালের ১লা আগস্টে নিউইয়র্ক শহরের মেডিসন স্কয়ারে অনুষ্ঠিত "দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ শীর্ষক" একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সাড়া জাগানো সংগীত শিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, বিটলস গায়ক বাংলাদেশের বন্ধু জর্জ হ্যারিসন, রিঙ্গোস্ট্রার, পন্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খান, আল্লারাখা,ববডিলন, এরিকক্লেপটনসহ অনেকে। সেই অনুষ্ঠানের পোস্টারটি মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। সেই কনসার্টের একটি পোস্টারের কপি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে প্রদর্শিত আছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ করে জর্জ হ্যারিসনের গাওয়া

৭। হারুন হাবিব সম্পাদিত, প্রত্যক্ষ দর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধঃ পৃষ্ঠা ৮২
৮। মাহামুদুল্লাহ সম্পাদিতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৫৯
৯। ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৩৮,

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশ বাংলাদেশ" গানটি সে সময় গোটা পাশ্চাত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকরে।

গানটির কিছু অংশে বলা হয়েছে

"বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
অস্তগামী সূর্যের শেষ রেশ
লক্ষ মানুষ নিহত, এই তো বাংলাদেশ।
বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্রাবাসে
ছাত্ররা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে
হঠাৎ সৈন্য গুলি ছোঁড়ে
দারুণ ত্রাসে
সন্ত্রাস কেড়ে নেয় সকল
ভয়ার্ত, তীক্ষ্ম আর্তনাদ
হিম শীতল পরিবেশ
রক্তেরাঙা বাংলাদেশ "[১০]।

"১৯৭১ সালে এ দেশের যুদ্ধপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর আয়োজন করা হয়। আয়োজকরা আর্তমানবতার সেবার এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনের এ কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন ৪০ হাজারেরও বেশি দর্শক শ্রোতা "[১১]। সাদা কালো এবং গোলাপী রঙয়ের ব্যবহার করা হয়েছে এই পোস্টারটিতে তিনজন গায়কের মাঝে হাড্ডিসার একটি যুদ্ধ পীড়িত বাঙালী শিশুর ছবি পোস্টারটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। "কনসার্টের টিকেট বিক্রি বাবদ সংগৃহীত ১ লক্ষ পাউন্ড ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ইউনিসেফ এর তহবিলে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া কনসার্টের রেকর্ড বিক্রি করে এর চারগুণের বেশি অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে অনুমান করা হয়"[১২]। পোস্টারটির নিচে লেখা :

The Greatest Concert of the decade now you can see it and hear it as if you were there! Apple present.

The Concert for Bangladesh.

পরিমাপ : ১০৪×৭০ সেঃ মিঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৩। পোস্টারঃ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন/ এরা আপনাদেরই সন্তান :

বাংলাদেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা মহান মুক্তিযুদ্ধ। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ। ত্রিশ লক্ষ বাঙালীর রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা। পাকবাহিনীর নির্যাতন আর ধবংসের তান্ডবে বিক্ষুব্ধ বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা দেশ মাতৃকা রক্ষাকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলা মায়ের তেজীয়ান বীর যোদ্ধারা কারও স্বামী, সন্তান, পুত্র ও কন্যা। ‘‘২১ জুন ১৯৭১ হবিগঞ্জের মনতলা কমপ্লেক্সের এক যুদ্ধে, বীরমুক্তিযোদ্ধা দৌলা মিয়ার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। মরণাপন্ন অবস্থায় সে ডান হাতে মেশিনগান ও বাম হাতে পেটের ক্ষত স্থান চেপে ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। শত্রু পক্ষের মেশিনগানের গুলি তার পায়ে ও পেটে বিদ্ধ হয়ে নাড়িভুড়ি বের হয়ে যায়। আহত হয়েও সে মেশিনগান দিয়ে শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে’’[১৩]। দৌলা মিয়ার মত লক্ষ লক্ষ সোনার সন্তান জীবন বাজি রেখে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী সহ সমগ্র বিশ্ববাসী মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছে, এই সচেতনতা জাগ্রত করাই ছিল পোস্টারটির লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যর জন্যে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি পাশাপাশি এগিয়ে এসে ছিলো বিশ্ব বিবেক।

‘‘মুম্বাই এর চলচ্চিত্র শিল্পীরা ২৪ নভেম্বর ১৯৭১ মুম্বাই এর বিখ্যাত ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের শরণার্থী ও মুক্তিবাহিনীর সাহায্যার্থে চলচ্চিত্র শিল্পীদের রজনী নামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন- দিলীপ কুমার, অশোক কুমার, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচচন, রাজকাপুর, ধর্মেন্দ্র, হেমাহালিনী, নার্গিস, রেখা, শর্মিল। ঠাকুর, জয়া ভাদুড়ীসহ প্রায় সবাই। এই অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত অর্থ ছিল করমুক্ত এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল’’ [১৪]।

পোস্টারটির পরিমাপ ৫১ X৩৬ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে এটি প্রকাশিত

১০। প্রথম আলো, সোমবার ৩ রা ডিসেম্বর ২০০১ পৃষ্ঠা নং ৮
১১। প্রথম আলো, শনিবার ১ লা ডিসেম্বর ২০০১ পৃষ্ঠা নং ১
১২। আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালীঃ বাংলাদেশ ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

১৪। Pakistan's Manmade Disaster in East Bengal:

এই পোস্টারটিতে সবুজ জমিনে লাল সূর্য এবং সূর্যের মধ্যে হলুদ রংয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পোস্টারটিতে কালো, লাল, সবুজ হলুদ রংয়ের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

- 75 Million Bangalis have see their clected representatives killed imprisoned or driven in exile.
- Massacres of Unarmed civilians by West Pakistan's army have forced 6 Million to flee to India.
- The population is helpless in the face of Spreading starvation and disease.
- The U.S is Continuing military aid to Pakistan.

Friends of east Bengal 4621 Larchwood Avenue, Philadelphia 19143 (215) GR 24-3969. KX4 – 8569K, 15- 1907.

এই পোস্টারটিতে বাংলাদেশে ৭১ এর গণহত্যা, ও পাকিস্তানীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে ১ কোটি শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় গ্রহন এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তান কে সামরিক সাহায্য প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ২৫ শে জুন ১৯৭১ সালে যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ ২৪ শে জুন মার্কিন অস্ত্র নিয়ে দুটি জাহাজ নিউইর্য়ক থেকে করাচীর পথে রওনা হয়েছে। এই জাহাজ দুটি কে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে অস্ত্র না দেওয়ার জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানায়। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণসিং আরো জানান যে, ভারত সরকার মার্কিন কর্তৃপক্ষ কে জানিয়েছেন যে, বর্তমানে যখন পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তখন পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি শুধু এই উপমহাদেশেই নয় সমগ্র অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতের অনুরোধ মার্কিন সরকার গুরুত্বের সথে বিবেচনা করবেন বলে ভয়েজ অব আমেরিকার এক সংবাদ রির্পোটে জানা গেছে। ২৫ জুন ৭১ এ আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশ, অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের জন্য ভারতে, ভারতীয় নাগরিক বৃন্দের সাথে শরণার্থীরা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের শরণার্থী বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারী মিঃ কেলোগকে ঘেরাও

Dhaka University Institutional Repository

করেন। মার্কিন প্রশাসন এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আগে কোন মার্কিন অস্ত্র পাকিস্তানে যাবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেওয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে নাই। এদিকে ৩ জুলাই ১৯৭১ সালে দৈনিক যুগান্তরে আরো একটি সংবাদ পরিবেশিত হয় আমেরিকা আরও অস্ত্র পাঠাচ্ছে পাকিস্তানে; যা ব্যবহৃত হবে বাংলাদেশে। যদিও মার্কিন নীতিনির্ধারকরা নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণের উপর। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বে অস্ত্র জোগাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে। মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও মার্কিন জনগন যেমন লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদের বড় অংশ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক। সিনেটের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদেরও এবং সর্বস্তরের আমেরিকাবাসীদের চাপ প্রথম পর্যায়ে না মানলেও পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবারহ বন্ধ করতে মার্কিন প্রশাসনকে বাধ্য করেছিল। এদিকে পূর্বপাকিস্তানে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানায় ‘‘ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ছাত্র, কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ তারা তাদের প্রতিবাদের আবেদন পত্রটি মার্কিন কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক মিঃ ওয়ালডি নিকট হস্তান্তর করেন। প্রতিবাদ সহ কিছু সুপারিশ তারা করেছিলেন। সুপারিশ গুলো হলো এই মুহূর্তে পাকিস্তানের গোলাবারুদ, খুচরা যন্ত্রাংশ বা সামরিক সরঞ্জাম সহ সব ধরনের সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। যতক্ষণ না সে দেশের সরকার পূর্বপাকিস্তানের জনগণের আকঙ্খার প্রতি সাড়া দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখা’’[১৫]।

আলোচিত পোস্টারগুলোতে স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিটি পোস্টারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কোন পোস্টারে মানুষের আবেগ আর কোনটাতে যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। তবে সবগুলো পোস্টারের মূলমন্ত্র বাংলার স্বাধীনতা। পাকিস্তানীদের নয় মাসের ধবংস ও হত্যার মধ্যদিয়ে জন্ম হয়, বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের। এই পোস্টারগুলোর মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

১৩। মেঃ জেঃ এ কে এম সফিউল্লাহ, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ; পৃ ১৪০
১৪। মোহাম্মদ নূরুল কাদের, দু'শো ছেষট্টিদিনে স্বাধীনতা; পৃ ৩৩৩
১৫।সোহরাব হাসান সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভুমিকাঃ পৃ- ৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

খ. মুক্তিযুদ্ধের ব্যাজ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে তখন সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সচেতন বিশ্ববাসীর চোখ ছিল বাংলাদেশের কোথায় কি ঘটছে। বিশেষ করে লন্ডন, আমেরিকা, ভারত, কানাডা, রাশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন কমিটি। একদিকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে বাংলার বীর সৈনিক, ইষ্টবেঙলরেজিমেন্ট, ই পি আর, পুলিশ বাহিনীসহ এদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, জনতা, নারী শিশুসহ আপমোট জনগণ। অন্যদিকে দেশের বাইরে চলছিল কূটনৈতিক যুদ্ধ। ১৯৭১ সালে লন্ডনে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রে পরিনত হয়। লন্ডনে বসবাসরত বাঙালীরা মুজিব নগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামকে নিঃসংকোচে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তেমনিভাবে ভারত আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বের সচেতন মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের হাত বাড়ায়। এর জন্য গঠিত হয়েছিল Bangladesh Action Committee সহ বিভিন্ন কমিটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গঠিত এই কমিটিগুলি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে বিভিন্ন প্রচার পত্র - যেমন লিফলেট, স্টীকার্স, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, ব্যাজ ইত্যাদি বিদেশী জনগণের মধ্যে বিলি করতো। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিদেশী জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ছিল এই প্রচার পত্রের লক্ষ্য। তেমনি কিছু ব্যাজ, স্টীকার্স, লিফলেট বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারীতে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

আলোচনার শুরুতে সে সময়ের কিছু ব্যাজের উপর আলোকপাত করা হলো।

১.ব্যাজ ঃ সংগ্রহ নম্বর ই-৮৬.৫৯৯৯

টিনের পাতের উপর রং করে ব্যাজটি তৈরী করা হয়েছে। তবে বর্তমানে ব্যাজটি সম্পূর্ণ মরিচা ধরা। ব্যাজটির উপরিভাগে সবুজ রংয়ের RECOGNIZE এবং নিচে সবুজ রংয়ে BANGLADESH লেখা। মাঝখানে লাল আউট লাইনে বাংলাদেশের ম্যাপ অংকিত। ছোট একটা ব্যাজের মাঝখানে বাংলাদেশের ম্যাপ- যা একটা দেশ, একটা জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করছে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের আগেই এই ব্যাজটি তৈরী হয়। এতে প্রমাণ করে যে বাঙালীর মনোভাব কত শক্তিশালী ছিল। বাংলাদেশ যে অদূর

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী হয়। এতে প্রমাণ করে যে বাঙালীর মনোভাব কত শক্তিশালী ছিল। বাংলাদেশ যে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা লাভ করবে এ বিষয়ে প্রচন্ডভাবে নিশ্চিত ছিল বাঙালী জনগণ। তাই তারা বাংলাদেশের ম্যাপ অংকিত ব্যাজ বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রচার করেছে। ম্যাপের লাল রং স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালীর রক্তের কথা। স্বাধীনতার জন্য এতো রক্ত অন্য কোন জাতি দিয়েছে কি না তা বলা কঠিন। RECOGNIZE BANGLADESH লেখাটি সবুজ রংয়ের, এই সবুজ রং বাংলার শ্যামল প্রকৃতি। ব্যাজে অংকিত সবুজ রং সমগ্র গ্রাম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছে। ব্যাজটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিশ্ববাসী কতটা সচেতন ছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া হলো :

"মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃটেনের বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। পলকনেট ও ম্যারিয়েট নামক দুজন বৃটিশ নাগরিক এই এ্যাকশন কমিটির নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তাদের সাথে আরো বেশ কিছু বৃটিশ নাগরিক জড়িত ছিলেন। বৃটেনে আন্দোলন চলাকালে পুরো সময়টাই বাঙালীদের প্রচেষ্টায় পরিপূরক হয়ে কাজ করেছে এই কমিটি। বৃটেনে বাঙালীদের প্রতিটি কর্মকান্ডের সাথেই ছিল তাদের সম্পৃক্ততা এবং একাত্মতা"[১]।

আমাদের আলোচিত ব্যাজটিতে উল্লেখিত বাক্য হলো RECOGIZE BANGLADESH. এই ধরনের বক্তব্য শুধু ব্যাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, পত্র-পত্রিকা, চিঠিপত্র, স্টীকার্স, পোষ্টারের মধ্যে এই ধরনের আবেদন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তেমনি একটি আপীলের উল্লেখ করা হলো ।

"Recognise and support Bangladesh"

We the people of Bangladesh, resident in Great Britain, on behalf of the people and the government of the Republic of Bangladesh, appeal to the people and Governments of the world, to immediately recognise and support "Bangladesh".

We are fighting not only for our freedom and independence but also for our very survival, and we ask for your help in our struggle for independence.

এই আপীলটি এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রচারিত। সূত্রঃ এ্যাকশন কমিটির দলিল পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh Action Committee
52, Wordsworth road
Small Heath
Birmingham-10
021-7731456"[2.]

২. ব্যাজঃ সংগ্রহ নং ই-৮৬.৬০০০

ব্যাজটি টিনের পাতের তৈরী। পেষ্ট সবুজ রংয়ের উপর কালোয় লেখা BANGLADESH। ব্যাজের সবুজ রং গ্রাম বাংলার চির সবুজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কালো অক্ষরে লেখা চির সবুজ গ্রাম বাংলার বুকে কালো অশুভ সংকেত বলে মনে হয়। এই কালো আরো মনে করিয়ে দেয় ২৫শে মার্চ ৭১ এর কাল রাত্রির কথা। যেন সবুজ শ্যামল বাংলার মানুষকে হায়নার তাড়া। ২৫শে মার্চ রাত্রি যেমন ঢাকা শহরটি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পিলখানা বা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিত হামলা, ৯ মাস অবরুদ্ধ বাঙালীর আতংকের মধ্যে দিন কাটানো, মৃত্যুর অন্ধকার গহবরে তলিয়ে যাওয়া এসব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করছে কালো রং। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব বিবেককে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছে। বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বেসরকারী পর্যবেক্ষক দল পাকবাহিনীর নৃশংস কর্মকান্ড দেখার জন্য ছুটে আসেন। বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এই অমানবিক হত্যাযজ্ঞের আলোকচিত্র ও প্রতিবেদন। পার্শ্ববর্তী দেশের উম্মুক্ত আকাশের নীচে অবস্থানরত বাংলাদেশী লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ যুবাবৃদ্ধ শিশুর আর্তনাদে জাগ্রহ হয় বিশ্ববিবেক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাঙালীরা বিদেশী শহরে মিছিল করেছে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মাদার টেরেসাসহ বিশ্বের মানবতাবাদী নেতারা সোচ্চার হয়েছিলেন এই লোমহর্যক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে। মুজিব নগর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা হয়েছে। বহির্বিশ্বে ব্যাপক কূটনৈতিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনগণের মাঝে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের যেখানেই সেদিন একজন বঙ্গসন্তান ছিলেন সেখানে নিজ অবস্থানে থেকেই তিনি গর্জে উঠে ছিলেন পাকিস্তানী

Dhaka University Institutional Repository

হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। কোন কোন দেশে পাকিস্তানী দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালী কূটনীতিকবৃন্দ মাতৃভূমির পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে, সেসব দেশেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন।

৩. ব্যাজ ঃ সংগ্রহ নং ই-৮৬.৬০০১

গোলাকার ব্যাজটি, টিনের পাতের উপর তৈরী। জাদুঘরে প্রদর্শিত ব্যাজগুলোর মধ্যে এটি অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির। ব্যাজটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বাংলা ইংরেজী এবং হিন্দি এই তিন ভাষাতেই লেখা রয়েছে। ব্যাজটির বৃত্তের উপরের অংশে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে EMERGENCY RELIEF FUND নীচের দিকে লেখা রয়েছে 33C A DAY TO SAVE A LIFE । মাঝখানে রয়েছে সবুজ রংয়ের মানচিত্র। এ যেন শান্তির প্রতীক সাদা মধ্যে সবুজ বাংলাদেশ। সবুজ শ্যামল বাংলার বুকে হায়নাকে তাড়িয়ে শান্তি বার্তা নিয়ে এসেছে সাদা রং। মানচিত্রের বামদিকে বাংলায় লেখা 'বাংলাদেশ' ডানদিকে হিন্দিতে লেখা 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এককোটি শরণার্থীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য বিশ্বের বিবেকবান জনগণের এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা ছিল অব্যাহত। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারনার জন্য তৈরী করা হয়েছিলো এধরণের ব্যাজ। বিভিন্ন ধরনের আবেদন নিবেদন এই ব্যাজে প্রতিফলিত হয়েছে । এধরণের একটা লিখিত জরুরী আবেদন, "বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লন্ডন ডিসেম্বর ৭১ -এ বাংলাদেশে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রবাসী বাঙালীদের কাছে এই আবেদন পত্রটি পেশ করেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুমুক্তির জন্য আজ জীবনমরণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আমরা প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অংশ নিতে না পারলেও তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে, সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য নিয়মিত সাহায্য করে যাচ্ছি। টাকা পয়সা ছাড়াও যে সব জিনিস মুক্তিবাহিনীর নিত্য প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সরাসরি বিনা খরচে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। প্রবাসী বাঙালী ভাইদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন সম্ভবমত নিম্নলিখিত জিনিসগুলে অতি সত্বর নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

১। আবু সাঈদ চৌধুরী- প্রবাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পৃ: ৪৭

২। মাহমুদ উল্লাহ (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র (১৯০৫-১৯৭১) দ্বিতীয় খন্ড, - পৃ. ৬৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিবাহিনীর জন্য যে সব জিনিস পাঠাবেন-

নতুন কাপড় ঃ পুলওভার, সোয়েটার ও কম্বল

খাদ্যদ্রব্যঃ টিনে ভর্তি মাংস, মাখন, চীজ, বিস্কুট ও ফলমূল

উপরোক্ত জিনিষপত্র আগামী ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে BANGLADESH MISSION, 24 PEMBRIDGE GARDENS, LONDON W-2 ঠিকানায় পাঠাবেন। বিস্তারিত জানার জন্য টেলিফোনে ০১-৪০৫৫৯১৭ নম্বরে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৩৫ নং গ্যামেজেজ বিল্ডিংস, ১২০ নং হবোর্ন, লন্ডন ইসি-১ অফিসে সন্ধ্যা ৭ টার আগে যোগাযোগ করুন [৩]।

৪. **ব্যাজঃ** সংগ্রহ নং ই-৮৬.৬০০২

পাতের তৈরী হালকা নীল রং এর ব্যাজটির মধ্যে গাঢ় নীল রং দিয়ে লেখা। ব্যাজটির উপরিভাগে লেখা Thou shalt not kill এবং মাঝখানে অপেক্ষাকৃত বেশ বড় অক্ষরে লেখা REMEMBER এবং এর পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

৫. **ব্যাজঃ** সংগ্রহ নং ই- ৮৬.৬০০৩

ব্যাজটি টিনের তৈরী। ব্যাজটির মাঝখানে হলুদ রংয়ের বাংলাদেশের ম্যাপ। ম্যাপটির বাইরে একটা লাল রংয়ের গোলকার বৃত্ত। লালবৃত্তের বাইরের দিকটায় রয়েছে একটা সবুজ রং এর বৃত্ত। সবুজ বৃত্তের উপরের অংশে লেখা আছে ইংরেজীতে Freedom and Relief এবং নীচে লেখা আছে For the people of East Bengal লেখাটি হলুদ রংয়ের। এখানে লাল সবুজ ও হলুদ এই ত্রিমাত্রিক রংয়ের সমন্বয় ঘটেছে। মূলতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাকামী বাঙালীদেরকে সাহায্য প্রদানের তাৎপর্য বহন করছে এই ব্যাজটি। পাকিস্তানী শাসকচক্রের শোষণে জর্জরিত বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণ অবতীর্ন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনী নিরস্ত্র সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশীদের উপর ঝাপিয়ে পড়লেও বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে নাই। এই ব্যাজটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ কাল রাতের পর এদেশে একটি পুতুল সরকার তৈরী করে বিশ্বকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করলেও এটা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পর এক পর্যায়ে মার্কিন কংগ্রেসের প্রবল চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তান সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

সাজসরঞ্জাম রফতানীর লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বন্ধুরাষ্ট্র চীন ও প্রত্যাখান করেছিল। তৎকালীন চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিপেংফেই বাংলাদেশের সমস্যার যুক্তিসংঙ্গত সমাধানের প্রতি পাকিস্তানকে সচেষ্ট হতে বলেছেন। ফরাসী সরকার বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন। জার্মানীর চ্যান্সেলর উইলিব্রান্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পশ্চিম জার্মান সরকারের এক ঘোষনায় বলা হয়েছে বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে পশ্চিম জার্মান সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মিঃ ষ্টোন হাউজ বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ হিটলার কর্তৃক ষাট লক্ষ ইহুদি নিধনের পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় শোকবহ ঘটনা বলে অভিহিত করেন।

৩। মাহমুদ উল্লাহ (সম্পাদিত) ঐ, পৃ ৬৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

গ. মুক্তিযুদ্ধের স্টীকার্স

1. CARE ENOUGH TO SAVE A LIFE-"BANGLADESH" EMERGENCY RELIEF FUND, 3308. S. CEDAR ST. LANSING. MICH

এই স্টীকার্সটিতে বাংলাদেশের ৭.৫০ মিলিয়ন জনগণ বাঁচার অধিকারের কথা বলা হয়েছে বাঙালীদের রক্ষা করার জন্য বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে এই স্টীকার্স এর ভূমিকা ছিল ব্যাপক। বিশ্বের মুক্তিকামী বিবেকবান মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্টীকার্স এর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। স্টীকার্স টি সাদার মধ্যে সবুজ রংয়ের লেখা। স্টীকার্সটি দেখতে ছোট হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভিত্তিক স্টীকার্স ও ব্যাজগুলোতে ব্যবহৃত রঙ ছিল বাংলাদেশের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রামীন বাংলার সবুজ রং এর বর্ণে লেখা 'Care enough to Save a life'. ১৯৭১ সালে পাকহানাদাররা যখন হত্যা করছে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীদের অনাহারে অভুক্ত এককোটি শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহন করেছে, অজস্র অভুক্ত বাঙ্গালী বন্দীখানা বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক, তখন বাংলার মানুষের এই দৈন্যদশা ঘুচাবার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠে বিশ্ববিবেক। জনমত গড়ে উঠে বাংলাদেশের স্বপক্ষে। প্রতিষ্ঠিত হয় emergency relief fund.

যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, সেই অনুষ্ঠানের প্রচার পত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ

"BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA PRESENT

Cultural Program- IN AID OF OVER SEVEN MILLION REFUGEES FROM BANGLADESH (EAST PAKISTAN) TO INDIA

DATE: 22nd AUGUST (SUNDAY)

PLACE: JERRERSON HIGH SCHOOL AUDITORIUM

2305, Pierce Street

TIME: 03.15 P.M.

PLEASE SEND YOUR GENEROUS CONTRIBUTION TO BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA"[১].

Dhaka University Institutional Repository

তেমনিভাবে বাংলাদেশীদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা ৩১ জুলাই ১৯৭১ তারিখে সত্যজিৎ রায়ের বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরটি নিম্নরূপঃ

"BENGALI FILM SHOW

A Bengali film, "DUI-KANYA" by Satyajit Ray (with English Subtitles) will be screened at the ODEON (Danforth and pape, near papa Subway) on Thursday, August 26, 1971. There will be four shows. The show has been organized in collaboration with the ICA. In aid of the Bangladesh refugees in India. We need Volunteers to sell tickets ''[২].

তেমনিভাবে Bangladesh women's Association in Great Britain ঈদের ফেতরাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য সাহায্যের জন্য আবেদন পত্রে বলেন "যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতরার পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাপড় চোপড় ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস খরিদ করে পাঠিয়ে দেবে । এ ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা"[৩]।

2. RECOGNIZE BANGLADESH FREE SHEIKH MUJIB

নীল রং উপর হালকা লেমন রংয়ের ছাপা হয়েছিল RECOGNIZE BANGLADESH FREE SHEIKH MUJIB ৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রে বঙ্গবন্ধু কে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে পাকিস্তানের এক দূর্গের সেলে বন্দী করে রাখা হয়। এদিকে পাকিস্তান জেলে বঙ্গবন্ধু থাকা অবস্থায় সামরিক আদালতে তার বিচার শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রতিবাদে এগারই আগষ্ট লন্ডনের হাইড পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। বেশকিছু বিদেশীসহ লন্ডন ও স্কটল্যান্ড থেকে আগত প্রচুর বাংলাদেশী এখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার প্রশ্নে সবাই তখন অত্যন্ত চিন্তিত ছিল। এই সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ঘোষণা করেছিলেন "বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা হানি বা জীবনের ক্ষতি হলে বাঙালী- কোনদিন পাকিস্তানকে ক্ষমা করতে পারবে না।

১। মাহমুদ উল্লাহ (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র ঃ ২য় খন্ড - পৃ ৭০৯।
২। ঐ,পৃ ৭১১।
৩। ঐ, পৃ ৮২০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা শব্দটি বাঙালী চিরদিনের মতো ভুলে যাবে"[৪]। এদিকে শেখ মুজিবের বিচারের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ৮ আগষ্ট ১৯৭১ সালে একটি প্রচারপত্র বিলি করে। নিম্নে প্রচার পত্রটির তথ্যগুলো দেওয়া হলোঃ

Action Committee for "The People's Republic of Bangladesh in U.K:

11 Goring Street, London. E. C. 3.

THE BENGALI COMMUNITY OF ONE HUNDRED THOUSAND PEOPLE RESIDING IN GREATBRITAIN HAS RECEIVED WITH DEEP ANGUISH AND SHOCK. THE NEWS THAT YAHYA KHAN HAS FINALLY DECIDED TO HOLD A MOCK TRIAL ON 11TH AUGUST OF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, THE DEMOCRATICALLY ELECTED LEADER OF SEVENTY FIVE MILLION PEOPLE OF BANGLADESH. PEOPLE BELIEVING IN DEMOCRATIC RIGHTSAND HUMAN VALUES NEED NOT BE TOLD AGAIN ABOUT THE CRIMES OF YAHYA KHAN IN SLAUGHTERING ONE MILLION, DRIVING EIGHT MILLION FROM THEIR COUNTRY. MAKING DESTITUTE THIRTY MILLION AND TERRORIZING THE SEVENTY FIVE MILLION PEOPLE OF BANGLADESH. HE HAS NOW DECIDED TO FLOUT INTERNATIONAL OPINION AND PROCEED WITH THE TRIAL. WE URGE THE BRITISH PUBLIC IN PARTICULAR AND WORLD OPINION IN GENERAL, TO RISE TO THE OCCASION AND ASK THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS TO INSIST THAT YAHYA KHAN PUT A STOP TO THIS SINISTER AND DANGEROUS ACT AND RELEASE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN IMMEDIATELY AND UNCONDITIONALLY"[৫].

শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে প্রবাসী বাঙালীরা এর প্রতিবাদ করে লিখিত পত্র প্রেরণ করেন। এ দিকে শেখ মুজিবের প্রহসন মূলক বিচার প্রসঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক সরকার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, তথাকথিত আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করে রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্টের (দূর্গে) অভ্যন্তরে ফায়ারিং স্কোয়ার্ড এর মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকরের রায় ঘোষণা করে। ঘোষণা পত্রে আরো বলা হয় যে পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে পাকিস্তানে তখন তাপমাত্র ১১০° ফারেনহাইট সে কারনে দ্রুত শেখ মুজিবের লাশ রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরেই দাফন কার্য সম্পাদন করা হবে। শেখ মুজিবের স্ত্রী বা অন্যকোন আত্মীয়ের নিকট লাশ হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত পাক সরকার নাকচ করে দেয়।

শেখ মুজিবের এই প্রহসনমূলক বিচারে- সোচ্চার হয়ে উঠে সারা বিশ্বের সচেতন সব মুক্তিকামী জনগণ। তাছাড়া গোপন বিচারকে লজ্জাকর এবং অন্যায় বলে অভিহিত করা হয় এবং তা করলে বিশ্ববাসীর কাছে পাকিস্তান নিজেকে হেয় করবে বলে উল্লেখ করা হয়। নানা দিক বিশ্লেষণের পরে উপসংহারে এসে বলা হয় শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য আমরা সর্বান্তকরণে অনুরোধ করছি। অন্যান্য বৃটিশ পত্রিকাতে অনুরূপ মত ব্যক্ত করা হয়।

"বাংলাদেশ পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায় ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন। খবরে প্রকাশ আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, এই তথাকথিত বিচার প্রহসনের আড়ালে শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে। এই হত্যা সংগঠিত হলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে দাড়াবে। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলও জনগণের মনোভাব কঠোর হওয়ার ফলে এদেশেও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সেই কারনেই আমাদের উদ্বেগ এত গভীর"[৬]।

আমাদের আলোচ্য স্টীকার্সটিও বিশ্বের মানুষকে শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচারের বিপক্ষে এবং শেখ মুজিবকে মুক্ত করার ব্যাপারে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

- দি গাডিয়ান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, "ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারের অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত ভারত উপমহাদেশের জন্য অধিকতর তিক্ততা যুদ্ধ ও ধ্বংস ডেকে আনবে। নয়া দিল্লী থেকে এক সংবাদে প্রকাশ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুরের বিচার অনুষ্ঠিত হলে তার পরিনাম 'গুরুতর' হবে বলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরনসিং পাকিস্তানকে সাবধান করে দেয়"[৭]।

৪। আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী, বাংলাদেশ ঃ ১৯৭, পৃ ১২০

৫। মাহমুদ উল্লাহ সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল প্রত্র, পৃ- ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

- দি টাইমস পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় নিবন্ধে শেখ মুজিবের গোপন বিচারের তীব্র নিন্দা করা হয়। গোপন বিচারকে লজ্জাকর বলে অভিহিত করে বলা হয়- এর ফলফল গুরুতর হওয়ার আশংকা থাকে"[৮]।

3. HELP BANGLADESH

BANGLADESH INFORMATION CENTER

423-5TH STREET S. E.

WASHINGTON D.C.-20003

কালো রংয়ের মধ্যে সাদা অক্ষরে লেখা HELP BANGLADESH. স্টীকার্সটির চারধারে সাদা বর্ডার দেওয়া। পাকিস্তানীদের বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলাদেশ। সেই বাঙালীদের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন। কথাটি সাদা রং এ লেখা। বাঙালীর জীবনের অমানিশার অন্ধকার কাটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় প্রতিটি বাঙালী সহ বিবেকবান মানুষ এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য।

ভারতের ইন্দিরাগান্ধী, মাদার টেরেসা, আমেরিকার সিনেটর কেনেডি, জার্মান চ্যান্সেলর, সোভিয়েত রাশিয়াসহ বৃটেন, ফ্রান্স ও সারা বিশ্বের সকল মানবতাবাদী শান্তিকামী জনগণ, বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশীদের সাহায্যার্থে জাতিসংঘের সাহায্য ও পুনর্বাসন সংস্থা থেকে তাঁবু, মশারি, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, তৈজষপত্র, শিশুখাদ্য, শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠন ও সাহায্যের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী এক আবেদন পাঠিয়েছিলেন আরব সাধারণতন্ত্র, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, আফগান, নেপাল, মালোয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লভিয়া, হল্যান্ড ও আরো অন্যান্য দেশে। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের আলোচিত ব্যাজ ও স্টীকার্স গুলো বর্হির্বিশ্বে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এই ব্যাজ ও স্টীকার্স গুলো স্বাধীনতার স্মারক হিসাবে জাদুঘর গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

400842

৬। আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী, বাংলাদেশ ঃ ১৯৭১; পৃ ১১৭
৭। হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১০ই আগষ্ট ১৯৭১, ঐ, পৃ ১২১
৮। টি টাইমস্‌, ১২ ই আগষ্ট ১৯৭১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ডাক টিকেট

ইংল্যান্ডে ২৬ শে জুলাই হাউজ অব কমন্স এর কোর্ট রুমে স্বাধীন বাংলাদেশের আটটি ডাকটিকেটের একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টের সকল দলের প্রায় সব সদস্য, মন্ত্রী ষ্টোন হাউজ, পিটার শোর এবং চল্লিশ জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এই ডাক টিকেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের আওয়ামীলীগের দলীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল মান্নান এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দশ পয়সার ডাক টিকেটে বাংলাদেশের মানচিত্র এবং পাঁচ পয়সার টিকেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি কৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। বৃটেনে অবস্থানরত বিখ্যাত বাঙ্গালী শিল্পী বিমান মল্লিক ডাক টিকেট গুলোর নকসা তৈরী করেন। বিদেশে চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য ভারত সরকার টিকেট গুলো ব্যবহার করেন। ২৯ শে জুলাই থেকে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট, অষ্ট্রেলিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে ডাক টিকেট পাওয়া যাবে বলে উদ্যোক্তারা জনান।

অনুষ্ঠানে জনাব চৌধুরী জানান ডাক টিকেট গুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ বাংলাদেশের জন্য উল্লেখ যোগ্য পদক্ষেপ। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জন স্টোন হাউজ শরণার্থীদের অবস্থা পর্যবেক্ষন এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সংগে পরামর্শের জন্য, ওয়ার অন ওয়ান্টএর পক্ষ থেকে কয়েকদফায় মুজিবনগরে যান। সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সংগে আলোচনা সাপেক্ষে ডাক টিকেট গুলোর প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এ ব্যাপারে বৃটিশ মন্ত্রী ও ডাক বিভাগের প্রাক্তন পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল জনষ্টোনহাউজ সরাসরি মুজিব নগরের নির্দেশে ও দায়িত্বে কাজ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ফান্ড বা ষ্টিয়ারিং কমিটির কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। মিঃ ষ্টোনহাউজ এগুলো মুজিবনগর সরকারের এবং ইউরোপে বিতড়নের জন্য ব্যবস্থা করে ছিলেন।

এদিকে কোলকাতাতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলী ডাক টিকেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে মোট ৮ ধরনের ডাক

Dhaka University Institutional Repository

টিকেট প্রদর্শিত হয়েছিল বলে জন্মভূমি পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশ। দশ পয়সার টিকেটে ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র, বিশ পয়সার টিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকান্ডের প্রতীকের ছবি, পঞ্চাশ পয়সার টিকেটে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রতীক, একটাকার টিকেটে বাংলাদেশের পতাকা, দুই টাকার টিকেটে আওয়ামীলীগের ৯৮% ভোটের বিজয়ের প্রতীক, তিন টাকার টিকিটে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষনার প্রতীক, পাঁচ টাকা টিকেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর ছবি, দশ টাকার টিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনের আদায়ের জন্য আবেদনের প্রতীক দেখা যাচ্ছে।

রণাঙ্গনে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত ডাকঘরে এ সব টিকেট পাওয়া যেত তেমনি কিছু ডাকটিকেট এই প্রবন্ধে সংযোজন করা হলো।

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালী, বাংলাদেশঃ ১৯৭১, আব্দুল মতিন পৃষ্ঠা নং ৯৫।
২। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড মাহমুদুল্লাহ সম্পাদিত পৃষ্ঠা নং

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. ওডারল্যান্ড এর স্মৃতি নিদর্শন

ডাব্লিউ আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড বীরপ্রতীক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহান বন্ধু ও সক্রিয় যোদ্ধা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীরপ্রতীক' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র বীরত্ব খেতাব প্রাপ্ত বিদেশী মুক্তিযোদ্ধা। ১৯১৭ সালে ৬ ই ডিসেম্বের আমষ্টারডামে জন্ম গ্রহনকারী এই বীর মুক্তিযোদ্ধা অষ্ট্রেলিয়ার পার্থে ১৮ মে ২০০১ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভিনদেশী এই বন্ধুর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ঢাকায় গঠিত হয়েছে নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিষদ। এই পরিষদ ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে ২রা জুলাই ২০০১ তারিখে জাতীয় জাদুঘরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিষদ ওডারল্যান্ডের কিছু স্মৃতি নিদর্শন জাদুঘরে উপহার প্রদান করেন। ওডারল্যান্ডের কিছু নিদর্শন এর নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(ক) বীর প্রতীক খেতাবের সনদঃ নিদর্শন টি মিলের কাগজে তৈরী। এতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর রয়েছে। প্রাধিকার ঃ বাংলাদেশ গেজেট নোটিফিকেশন নং ৮/২৫/ ডি -১/৭২ ১৩৭৮-তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩। আজন্ম যোদ্ধা এই অসীম সাহসী মানুষটি ছিলেন প্রকৃত বীর যোদ্ধা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অশান্ত আমস্টারডামে জন্ম গ্রহন কারী এই লড়াকু যোদ্ধা নিজ মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।সাংবাদিক হারুন হাবীব এর এক লেখা থেকে জানা যায় ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওডারল্যান্ড যোগ দিয়েছিলেন, এ সময় তিনি পরিচিত ছিলেন সার্জেন্ট ওডারল্যান্ড নামে। জার্মান বোমার আঘাতে হাজার হাজার হল্যান্ড বাসী তখন মৃত্যুবরণ করছে। এ সময় বন্দী হলেন যোদ্ধা ওডারল্যান্ড। এই বন্দী শিবির থেকে কৌশলে তিনি পালিয়ে যান এবং যোগদেন ডাচ আন্ডারগ্রাউন্ড এসিস্ট্যান্ট মুভমেন্টে। এরপর যুদ্ধ থামলে চলে আসেন সিঙ্গাপুরে। পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যান এবং বাটা সু কোম্পানীর পুরাতন চাকুরীতে যোগদান করেন''[১]।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর কিছু দিন পূর্বে তিনি বাটা সু - কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদে যোগদান করেন। ওডারল্যান্ডের

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর কিছু দিন পূর্বে তিনি বাটা সু - কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদে যোগদান করেন। ওডারল্যান্ডের সহকর্মী এবং বাটা সু কোম্পানীর প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার জনাব এম. এ. হাই এর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ২৫ শে মার্চ এবং পরবর্তী ৯ মাস পাকবাহিনীর নৃশংসতায় ওডারল্যান্ড অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও মর্মাহত হয়েছিলেন। নিজের বিপদের কথা চিন্তা না করে গোপনে হত্যা ও ধবংসযজ্ঞের ছবি তুলে বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াতে পাঠান। কর্মসূত্রে ঢাকায় এসে ওডারল্যান্ডের সাথে পরিচয় হয়েছিল বাটা সু কোম্পানীর পার্সোনাল ম্যানেজার (অবঃ) কর্ণেল নেওয়াজ এর সাথে। সেই সূত্র ধরে তার সেনা সদরে অবাধ যাতায়াত শুরু হয়। ‘‘সেনা সদর থেকে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাশ জোগাড় করেছিলেন যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময় কাজে লেগেছে।

(১) ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন পাশ

(২) সেনা বাহিনীর ইনটেলিজেন্সের গোপন পাশ, যা দিয়ে যে কোন সামরিক বেসমারিক গোপন জায়গাতে বিনা বাধায় যাওয়া যেতো।

(৩) যখন খুশি সেনা সদরে যাওয়ার পাশ।

এই সব পাশ কাজে লাগিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, পাক বাহিনীর অনেক গোপন তথ্য সরবরাহ করেছেন। তার এ জাতীয় কর্মকান্ডেবাধা দেন নাই তখনকার অষ্ট্রেলীয় হাই কমিশনার। তাছাড়া বাটার কর্মকর্তা আবদুস সালাম, হুমায়ুন কবীর খান, নূরুল ইসলাম, ডাঃ হাফিজুল ইসলাম ভূইয়া ও আই, সি, ডি ডি আর বি এর কর্মকর্তা, আমেরিকান নাগরিক ট্রাকার প্রমূখদের নিয়ে একটি টিম ওয়ার্ক গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে আব্দুস সালাম ও হুমায়ুন কবীর খানকে তিনি গেরিলা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার আগরতলায় পাঠান। ওডারল্যান্ডের যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বিশিষ্ট বন্ধু জনাব হাই আরো জানান যুদ্ধকালীন দিনগুলোতে তিনি পাক বাহিনীর রণকৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডর প্রয়াত মেজর এ টি এম হায়দার, জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর কাছে সরবরাহ করতেন। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

টাকা ঔষধ পত্র কাপড় এবং অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত পিস্তলটি বুলেট সহ যুদ্ধের জন্য দুই নং সেক্টরের এক নম্বর প্লাটুন কমান্ডার এ কে এম জয়নুল আবেদীনকে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজের কমান্ডো বাহিনী অর্তকিত হামলা চালিয়ে রাস্তাঘাট, পাওয়ারহাউজ ধবংস করে পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে তাকে দেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'বীর প্রতীক' খেতাব। খেতার প্রাপ্তিতে অভিভূত হয়ে তিনি বলেছিলেন 'হ্যাপিলী সারপ্রাইজড' এর চেয়ে গৌরবের আর কি হতে পারে। জনাব এ,কে এম হাই আরো জানান যে ওডারল্যান্ডের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদক গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ওডারল্যান্ডের পক্ষে আব্দুল হাই এ পুরস্কার গ্রহন করেন। পরবর্তীতে ৯৩ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে এ পদক হস্তান্তর করা হয়। এই বীরত্ব পদকের সনদটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উপহার প্রদান করেন জনাব এ কে এম আব্দুল হাই।

(২) ওডারল্যান্ডের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র ঃ

পরিমাপঃ ৩০×২১ সেঃ মিঃ

মিলের কাগজে টাইপ করা পত্রটিতে ওডারল্যান্ডের স্বহস্তের স্বাক্ষর রয়েছে। পত্রটিতে তিনি তাঁর বর্নিল জীবন কাহিনী বর্ণনা করেন। বিশেষত তার জন্ম সময় কালের, দ্বিতীয় বিশ্বেযুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং কেন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেন।

ওডারল্যান্ড কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এসম্পর্কে ঢাকায় ফ্রিডম ফাইটার্স কালচারাল কমান্ডের, একজন মেম্বার এর লেখা পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, ওডারল্যান্ড এই উত্তর টি পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তী কালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিষদ এর পক্ষ থেকে এই পত্র টি জাতীয় জাদুঘরে উপহার প্রদান করা হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীর ট্যাংক হামলার সূত্রপাত দেখে ওডারল্যান্ড বুঝতে পেরেছিলেন বাঙ্গালীদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। বাঙ্গালীদের অসহ্য দুঃখকষ্ট এবং পাকবাহিনীর সীমাহীন নির্যাতন ওডারল্যান্ডকে বিচালিত করে তোলে।

১। নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ব্রোশিউর থেকে প্রাপ্ত তথ্য- ঢাকা ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি গোপনে বাটা কোম্পানীর সাহসী বাঙ্গালী সহকর্মীবৃন্দ এবং ১, ২ নং সেক্টরের আশে পাশের সাহসী মানুষদের নিয়ে গেরিলা মুভমেন্ট শুরু করেন। বাংলাদেশের সাধারন মানুষের জন্য তার অকুণ্ঠ ভালবাসা ছিল, সে কারণেই তিনি অস্ত্র হাতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

(২) নেকটাই : পরিমাপ : ১৩০ সে মি (দৈর্ঘ্য)

টাইটি সবুজ রংয়ের সিনথেটিক কাপড়ে তৈরী, টাইটির সামনে বাংলাদেশের পতাকার ভেতরে হলুদ রংয়ের মানচিত্র অংকিত। রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম অংকিত সবুজ রংয়ের টাইটি ১৯৭২ সালে জেনারেল ওসমানী ওডারল্যান্ড বীর প্রতীককে উপহার প্রদান করেছিলেন।

একজন বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও নিজের বিবেকের তাড়নায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক হত্যাকান্ডে তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ গর্জে উঠে ওডারল্যান্ড বীর প্রতীকের অস্ত্র। যুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বীর প্রতীক উপাধীতে ভূষিত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু বিদেশী ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহন করেছিলেন। তবে একজন বিদেশী নাগরিকের পক্ষে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার ঘটনা বেশ বিরল। দুঃসাহসিক গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে বিদেশীদের মধ্যে ওডারল্যান্ডের নাম ছিল সর্বাগ্রে। তার নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজের কমান্ডবাহিনীবহু অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। কৌশলগত কারণে তিনি পাকিস্তানী সেনা অফিসারদের সাথে যোগযোগ রক্ষা করতেন এবং তাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। মানব মুক্তির আজীবন এই যোদ্ধা, মানুষের প্রতি অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিবেকবান এক জাগ্রত সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। এই দর্শন থেকেই তিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ওডারল্যান্ডকে উপহৃত এই নেকটাইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিদেশী হয়েও তিনি বাঙ্গালীদের মতন স্বাধীনতার পর একটা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতার পর ওডারল্যান্ড বেশ কিছু দিন এদেশে ছিলেন। তিনি হয়েছিলেন বাংলাদেশের আপন জন। ওডারল্যান্ডকে প্রদত্ত টাইটির সবুজ রং প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলার চির সবুজ শ্যামল প্রকৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) সনদঃ মিলের কাজের উপর ইংরেজীতে টাইপ করা ঢাকা সদর উত্তর মহকুমার মুজিব বাহিনী প্রধান কাজী মোজাম্মেল হক এর স্বাক্ষরিত সদনটি নিম্ন রুপঃ

TO WHOM IT MAY CONCERN (CAPITAL LETTER)

It is known to me that Mr. W.A.S Ouderland company Manager, Bata shoe co. (Bangladesh Limited) Tongi Dacca has taken active part in the Guerilla operations in and around Dacca Since the 25th of march, 1971 in training and advising people as well as collecting intelligence infor motion Besides these he has given moral support to the people of Bangladesh and provided cash medicines and clothings to the freedom fighters for the liberation of Bangladesh was specially associated with the Mujib Bahini in Tongi Area. All concerned are requested to provide him assistance needed during his stay in Bangladesh.

Signature

KAZI MOZAMMAL HAQUE

ওডারল্যান্ড বীর প্রতীকের যুদ্ধকালীন কার্যাবলী, এই প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যয়ন পত্রের বিষয়বস্তু হলো ওডারল্যান্ডের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতিপত্র। একজন গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উপদেশ, নগদ অর্থ প্রদান, ঔষধপত্র, শীতবস্ত্র কারিগরী এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্যে করেছেন। ওডারল্যান্ডের বাটা সু কোম্পানীর সহকর্মী জনাব আব্দুল হাই এর সাথে আলোচনা করে জানা গেছে তিনি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পাক সেনাঅফিসারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের কৌশল গুলো জেনে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জানাতেন। ওডারল্যান্ড আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা তথা শিশুঘাতী, ও নারী ঘাতী বর্বরতার প্রচুর ছবি তুলেছিলেন যা বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে যথেষ্ট সাহায্যে করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্তিতে তিনি প্রচন্ড খুশি ছিলেন। তাইতো তিনি তার নাম লিখতেন উইলিয়াম এ, এস ওডার ল্যান্ড বিপি।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালীর জীবন বাজি রাখা এ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে প্রায় 'ত্রিশ লক্ষ' মানুষ। দুই লক্ষ নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে। ধবংস হয়েছে বিপুল সম্পদ ও অবকাঠামো । দেশের অমিত সাহসী সন্তানেরা যেমন অকাতরে বুলেটে প্রাণ দিয়েছে তেমনি বিশ্ববিবেক পাকিস্তানী শাসক ও সেনা বাহিনীর গণহত্যা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচচার হয়েছিল। বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ, লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক ও বেসামরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অন্যান্য বিদেশীদের তুলনায় ওডারল্যান্ডের ভূমিকা ছিল ভিন্ন। ওডারল্যান্ড একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন, অপরদিকে তেমন পাক সেনা অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের গোপন তথ্য গুলো জেনে মুক্তিযোদ্ধা সহ সেক্টর কমান্ডারদের জানাতেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গেরিলা অপারেশনে অংশ নিতেন। এই ভিনদেশী বন্ধুর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তার এই স্মৃতি নিদর্শন গুলো আমাদের আগামী প্রজন্মকে বীর প্রতীক ওডারল্যান্ডের সাথে পরিচিত করে তুলবে। আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য আমাদের স্বাধীনতা সব কিছু ধারক বাহক জাদুঘর। আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে ওডারল্যান্ড যে বিশাল ভূমিকা তা অনাদি কাল ধরে জাগিয়ে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে এই ভিনদেশী আপনজনের স্মৃতিকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ওডারল্যান্ড চিরঞ্জিব।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিল

উনিশ'শ একাত্তর সালে বাঙ্গালী জাতি এক প্রচন্ড দুঃসময় অতিক্রম করেছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ছিল বাঙ্গালীর জন্য বৃটিশ রাজত্ব থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। ১৯৪৮ সাল থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিকতাবাদী পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগনের সঙ্গে ভাষা প্রশ্নে মত বিরোধ ঘটে। ১৯৫২ সালে এ মত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে যা বাংলার মানুষকে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। উর্দূকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে হাজার বছরের পুরাতন ঐতিহ্যময় বাঙ্গালী সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা ও মাতৃভাষাকে ধ্বংস করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি সমগ্র পৃথিবীকে আবারও তার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত স্বাধীন সত্ত্বার কথা প্রমাণ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত গৌরবোজ্জল স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার সশস্ত্র সংগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগতভাবে এটা ছিল স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী জাতির সহজাত অনুভূতির এক বর্হিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলা একাডেমী। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আদেশে গঠিত হয় জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদ। (মন্ত্রণালয়ের স্মারক 5IV/10-A60/72/82(13) Edu dated 15-7-72"[১] বাংলা একাডেমীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশনার জন্য সরকার নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন- এরা হলেন ড. মযহারুল ইসলাম, সভাপতি (মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী) সদস্য ড. এ এফ সালাহউদ্দিন আহমেদ, ড. মফিজুল্লাহ কবির, ড. মমতাজুর রহমান তফরদার, ড. আনিসুজ্জামান, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, ড. কাজী আব্দুল মান্নান, জনাব আ কা মো যাকারিয়া, অধ্যাপক আবুল ফজল, জনাব সিকান্দার

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা প্রকল্পে তথ্য উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য ৩৪ জনকে গবেষণা সহায়ক ও তথ্য সংগ্রাহক পদে এবং তাদের কাজ তদারক করার জন্য দুই জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এরা হলেন অধ্যক্ষ নূরুল করিম ও খোদেজা বেগম। এই পরিষদ দেশব্যাপী তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে এবং পৃথক পৃথকভাবে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট দল বিভাগীয় শহর, জেলা, মহকুমা থানা, ইউনিয়ন, এমনকি গ্রাম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যান। এক বৎসর মেয়াদী পরিষদের সময়কাল শেষ হলে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পরিষদের দায়দায়িত্ব বাংলা একাডেমী উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে বাংলা একাডেমী এ কাজ বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে হস্তান্তর করেন”[২]।

অনুরূপ ভাবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও একটি মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প গ্রহন করেছিল। এ প্রকল্প অনেক মূল্যবান দলিল পত্র উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলো ত্রিশ খন্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেয়। এ সময়ে সৈনিকদের অনেকের সাক্ষাৎকার ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়”[৩]।

“১৯৭৭ সালের দিকে বাংলা একাডেমী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর এ বি এম হবিবুল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার প্রেস সেক্রেটারী জনাব আকবর কবীরকে বিষয়টি নোট করার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মোতাবেক তথ্য মন্ত্রণালয় এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেগুনবাগিচায় অবস্থিত তথ্য মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ এন্ড রেফারেন্স সেকশনের কর্মকর্তা জনাব খলিলুর রহমান এই প্রকল্পের প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরী (পি.পি) করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন এবং এই অফিসের দু’টি কক্ষে মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের অফিস চালু হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে।

১। প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ, প্রবন্ধের নাম (মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস রচনা সমস্যা ও সম্ভাবনা) প্রবন্ধকার আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পৃ-৪৬, এই প্রবন্ধের বেশ তথ্য ও উপাত্ত হিসাবে আমার গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যা ঘটেছে সেই সব তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় এই প্রকল্পের উপর।"[8]

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য চারজন গবেষক নিয়োগ করা হয়। "এরা হলেন সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা ও ওয়াহিদুল হক"[৫]। প্রকল্পের পরিচালক পদে নিয়োগ দান করা হয় দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমানকে ।

দলিল এবং তথ্য প্রামান্যকরণের জন্য সরকার নিম্নলিখিত নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রামান্যকরণ কমিটি গঠন করেন।

চেয়ারম্যানঃ প্রফেসার মফিজুল্লাহ কবীর- প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্যবৃন্দ ঃ ড. সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান- প্রফেসর (বাংলা বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সফর আলী আকন্দ, পরিচালক (ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ড. এনামুল হক, পরিচালক, (তৎকালীন ঢাকা জাদুঘর), ড. কে এম মোহসীন সহযোগী প্রফেসর (বর্তমানে প্রফেসর)ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. কে এম করিম, পরিচালক, (বর্তমানে অবঃ) জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদফতর, ড. শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, (বর্তমানে প্রফেসর) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব হাসান হাফিজুর রহমান- সদস্য সচিব।

ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে প্রকল্প কাজ শুরু করলেও উপাত্তের ব্যাপকতার কারণে পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ হিসাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের প্রকাশিত ১৫ খন্ড দলিলের ভূমিকায়, প্রকল্প পরিচালক হাসান হাফিজুর রহমান বলেন,

২। ঐ, পৃ-৪৭
৩। ঐ, পৃ-৪৭
৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইতিহাস প্রকল্পের কর্মকর্তা সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৫। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র; প্রথম খন্ড (ভূমিকা পৃঃ ১০)

Dhaka University Institutional Repository

"সমকালীন কোন ঘটনা বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে- ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে"[৬]। ১৯৭৭ সালে প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রথম দুই বৎসর তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহের কাজ করা হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে উপাত্ত সংগ্রহ করে।

প্রকল্পের শুরুতে মূল পরিকল্পনায় ৭২,০০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের সিদ্ধান্ত থাকলেও তথ্য প্রাপ্তির বিশালতার কারণে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি খন্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা করে সর্বমোট ১৫,০০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের জন্য অনুমোদিত হয়। যেসব ঘটনা আন্দোলন ও কার্যকরণ এ ভূ-খন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, মূলতঃ সেগুলোর কালানুক্রমিকভাবে দলিলগুলোতে সাজানো হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে কালানুক্রমিকভাবে দলিলগুলো সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে খন্ডগুলো শ্রেণীভাগ করেছেন প্রামাণ্যকরণ কমিটির বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

এ প্রকল্পের প্রথম পর্ব ১৯৭৮-৮৫ সালের জুন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত স্থির হয়। প্রকল্প আরো এক বৎসর বর্ধিত করে ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ হয়েছিল ৭২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা । দ্বিতীয় পর্যায়ে বরাদ্দ হয়েছিল ৪২ লক্ষ টাকা। প্রথম পর্বে মুদ্রণের কাজ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮৫ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়। কিন্তু এ পর্বে ডি এফপি কর্তৃক প্রকাশিত এ্যালবাম ছাড়া অন্য কোন কাজ হয়নি। অথচ প্রাথমিক প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য বিচার বিশ্লেষণ করে প্রামান্যকরণ কমিটি মেয়াদবৃদ্ধি করে অন্ততঃ আরো ছয়টি খন্ডের দলিল প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথম পর্বে **প্রকাশিত দলিলের খন্ডসমূহ:**

প্রথম খন্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)

দ্বিতীয় খন্ড, পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)

৬। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ১ম খন্ড (ভূমিকা পৃ-৩)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় খন্ড, মুজিব নগরঃ প্রশাসন

চতুর্থ খন্ড, মুজিব নগরঃ প্রবাসী বাঙ্গালীদের তৎপরতা

পঞ্চমত খন্ড, মুজিব নগর বেতার মাধ্যম

ষষ্ঠ খন্ড, মুজিব নগর ঃ গণমাধ্যম

সপ্তম খন্ড, পাকিস্তানী দলিল পত্রঃ সরকারী ও বেসরকারী

অষ্টম খন্ড, গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা

নবম খন্ড, সশস্ত্র সংগ্রাম-১

দশম খন্ড, সশস্ত্র সংগ্রাম-২

একাদশ খন্ড, সশস্ত্র সংগ্রাম-৩

দ্বাদশ খন্ড, বিদেশী প্রতিক্রিয়াঃ ভারত

ত্রায়োদশ খন্ড, বিদেশী প্রতিক্রিয়া ঃ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র

চর্তুদশ খন্ড, বিশ্ব জনমত

পঞ্চদশ খন্ড, সাক্ষাৎকার

দলিল সংগ্রহ পদ্ধতিঃ "দলিলপত্র সংগ্রহ করতে প্রায় দুই বৎসর লেগেছে বলে প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা জানান। দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি ব্যাক্তিগতভাবে যোগাযোগ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিকার দফতর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয় কিন্তু আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। তবে বাংলা একাডেমী তাদের সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য ও দলিল পত্রাদি প্রকল্পকে হস্তান্তর করেছিল। মুক্তি যুদ্ধের দলিল পত্র সংগ্রহে ক্ষেত্রে প্রকল্পের চেষ্টা ব্যাপক ও খোলামেলা। কিন্তু প্রকল্পের আবেদনের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। কারণ হিসেবে প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ ইতিহাসের গুরুত্ব সর্ম্পকে অসচেতনতা, দ্বিতীয়তঃ ভিত্তিহীন সংশয়"[৭]। অনেকেই তাদের কাছে রক্ষিত দলিল ও তথ্যাদি হাত ছাড়া করতে রাজী হননি। অনেকে দলিলের ফটোকপি জমা দিয়েছেন এবং মূলকপি নিজের কাছে রেখেছে। দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে যেহেতু কোন সরকারী অর্ডিন্যান্স পাশ করা হয়নি, সেহেতু ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই উপাত্তগুলো সংগৃহীত হয়েছে। এই সংগৃহীত দলিলসমূহ ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা। এগুলোর প্রাথমিক নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পের গবেষকবৃন্দ। প্রকল্পের গবেষকবৃন্দ নির্দিষ্ট খন্ডের গ্রন্থের জন্য বাছাইকৃত দলিলাদি প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি এই পেশকৃত তালিকাগুলোর গুরুত্ব ও যথার্থতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত দলিল ও তথ্যসমূহ গ্রন্থে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য অনুমোদন দেন। সাড়ে তিনলক্ষ পৃষ্ঠা দলিলের মধ্যে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র গ্রন্থের জন্য বাছাই করা হয়েছে। অনেক সময় প্রামাণ্যকরণ কমিটি হয়তো প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত তালিকার কোন কোন অংশ বাদ দিয়ে, সেই স্থানে কমিটির সদস্যবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলিলে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেই স্থানে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের উপর অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৮৩ সালে প্রকল্প পরিচালক হাসান হাফিজুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন; এর ফলে প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসময়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব সাময়িকভাবে প্রকল্পের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেও মূলত প্রকল্পের গবেষক চারজনই প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যান। এভাবে কিছু দিন চলার পর তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নাজিমউদ্দিন হাশেম এবিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ে একটা জরুরী সভা ডেকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর কে, এম মোহসিনকে প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোঃ এরশাদ ইতিহাস গবেষণাসংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. এ মজিদ খানকে নির্দেশ দেন। শিক্ষামন্ত্রী একটি খসড়া প্রস্তুত করেন, যাতে বলা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পকে ভিত্তি করে “বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা” নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্থায়ী স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। সংস্থাটি পরিচালনার জন্য সতের জন সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাষ্টিবোর্ড গঠনের প্রস্তাব ছিল। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন অনুদানের প্রস্তাব এর অর্ন্তভূক্ত ছিল। সংস্থাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ গবেষণা পরিচালনা, গ্রন্থ রচনা এবং প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সংস্থা দেশবাসীকে সচেতন করে তুলবে। পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলেও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে।"[৮] প্রেসিডেন্ট এরশাদের নির্দেশ মোতাবেক ১৯৮৫ সালের ৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা। তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী ড. এ. মজিদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। তথ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, প্রেসিডেন্টের অর্থ উপদেষ্টা বৃন্দ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের পাশাপাশি 'বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণাসংস্থা' এর অধীনে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ ও জনশক্তিসহ সকল সম্পদ ও দায় দায়িত্ব অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ১৯৮৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকল্পের মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়নি। শেষের দিকে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব এম আর আখতার মুকুল। তিনি এসে প্রকল্পের বেশ কিছু রদবদল করেন। প্রামাণ্যকরণ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে সৈয়দ আলী আহসানকে নিয়োগ দেন। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়া প্রসঙ্গে প্রকল্প দলিলের ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে, ইতিহাস সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইতিহাস প্রকল্পকে অধিগ্রহণ করা হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণবশত সেটা বাস্তবায়ন হয়নি। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২৬/ ১০/ ৮৭ এবং ১৯/ ১২/ ৮৭ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের কাছে দুটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। ২৪.১১.৮৭ তারিখ পরিচালকের কাছে পাঠানো পত্রে বলা হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজগুলো Bangladesh center for Historical Research নামে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত হবে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকল্পের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

১৯ জুন ১৯৮৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হোসাইন মোহম্মদ এরশাদ আকস্মিক প্রকল্প পরিদর্শনে আসেন এবং কয়েকদিন পর ২৪ জুন প্রকল্প বাতিলের চিঠি প্রকল্প অফিসে প্রেরিত হয়। প্রকল্পের পরিসম্পদগুলো Department of Film and publication (DFP) কে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং ছাপাকৃত দলিল এর অবিক্রিত খন্ডগুলো (বই আকারে) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওখান থেকে বাকী বইগুলো বিক্রি করা হয়।

৭। ঐ, পৃ- ৬,
৮। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন; ঐ, পৃ- ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

DFP এর স্থান সঙ্কুলানের অভাবে দলিলাদি ও তথ্যসমূহ বস্তাবন্দী করে তাদের গ্যারেজে রাখা হয়। যদিও আর্কাইভ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী এগুলো জাতীয় মোহফেজ খানায় সংগৃহীত হওয়ার কথা, কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি। যাহোক পরিসম্পদগুলো ডি এফ পি গ্যারেজে রাখার বিষয়টি তৎকালীন বাংলাদেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি সরজমিনে পরিদর্শনে যান এবং এ অবস্থা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই পরিসম্পদগুলোকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য জাদুঘরের তৎকালীন মহাপরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

এবিষয়ে ১৯৮৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বুধবার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়-"**৭২ ঘন্টার মধ্যে আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ**"

"তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ গতকাল কাকরাইলস্থ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন। তিনি দফতরের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন এবং সেখানে গ্যারেজে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হইতেছে দেখিয়া তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবান দলিল ও বইপত্র জাতীয় যাদুঘর ও জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরের জন্য সম্প্রতি যে আদেশ দিয়াছেন তাহা ৭২ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন কার্যকর করার জন্য কাজী জাফর লিখিত নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে গাফিলতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া কাজী জাফর বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত তথ্য দলিলপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রের চাইতে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না"[৯]।

বাংলাদেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে মহাপরিচালক জাতীয় জাদুঘর জরুরী ভিত্তিতে একটি কমিটি করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস বিভাগের উপ-কীপার জনাব রেজাউল করিমের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মোঃ আলমগীর, স্বপন কুমার বিশ্বাস, সিরাজুল ইসলাম, আবু ইউনুস এবং খুররম মিয়া। এছাড়াও কাজের সাহায্যের জন্য জাদুঘরের রেজিষ্ট্রেশন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় লোকবল নেওয়া হয়। হস্তান্তর কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তৎকালীন মহাপরিচালক ড. এনামুল হক।

৯। দৈনিক ইত্তেফাক; প্রথম পাতা ২৮/১২/৮৮

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘর কিভাবে হস্তান্তর সমাপ্ত করে, এ বিষয়ে সেই কমিটির আহ্বায়ক মোঃ রেজাউল করিম জানান- জাদুঘর থেকে তার নেতৃত্বে ছয়জন অফিসারসহ কিছু কর্মচারী নিয়ে তারা ডিএফপি গ্যারেজের বস্তাবন্দী দলিলগুলো খোলেন। প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশয় ছিল তারা ৭২ ঘন্টার মধ্যে কাজটি শেষ করতে পারবেন কিনা? এই জন্য তৎকালীন মহাপরিচালক এর সাথে কমিটির সদস্যবৃন্দ আলোচনা করে দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য একটা সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

তারা ফাইল গুলোতে একটি নিজস্ব সিরিয়াল নম্বর দিয়ে এবং ঐ ফাইলের ভেতর কতগুলো পৃষ্ঠা আছে সেগুলোর সম্ভব মত বিষয়বস্তুসহ ফাইলগুলোর পরিচয় লিপিবদ্ধ করে পৃষ্ঠাগুণে তার একটি কপি ফাইলের ভেতর রেখে আরেকটা কপি অফিসে কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। এইভাবে ফাইলগুলো পৃথক হিসাব করে বেধে জাদুঘরে আনা হয়। জাদুঘরের পক্ষ থেকে ফাইলগুলো গ্রহণ করেন মোঃ রেজাউল করিম এবং ডি এফপি এর পক্ষে হস্তান্তর করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব হাওলাদার। ৭২ ঘন্টার মধ্যে কাজ সমাপ্তির নির্দেশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কাজটি সম্পন্ন করতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগলেও অফিশিয়ালী ৭২ ঘন্টার মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। ডি এফ পির গ্যারেজ থেকে প্রায় ১৫৫০ শত ফাইল দলিল আনা হয়েছিল বলে জনাব করিম জানান। এই ফাইলগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ছিল, সেগুলোও আনা হয় (যদিও ক্যাসেটগুলো ক্রুটিপূর্ণ এবং প্রায় অচল ছিল)।

দলিলগুলো জাদুঘরে আনার পর জাদুঘর লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের নির্মিত্তে সিরিয়ালী রাখা হয়েছে। বর্তমানে এগুলো জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরে সংরক্ষণের পর থেকে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ও গবেষকদের গবেষণা কর্মে জাদুঘরের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছে; যেমন বিজয় কেতন জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ ফটোকপি ও স্ক্যান করে নিয়েছে। তাছাড়াও গবেষকদের গবেষণা কর্মেও সাহায্য করা হয়ে থাকে। দলিলপত্রগুলো জাদুঘরে সংরক্ষিত হলেও জাদুঘরের নিজস্ব লোক বলের অভাবের কারণে গবেষণা করে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্মসম্পাদনের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দুজন লোক বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব পেশ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল, যাতে উক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ জাদুঘরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নাই, ফলে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে দলিলগুলো কার্যপযোগী করা এখনও সম্ভব হয়নি।

তবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৎসর কয়েক পূর্বে এক জরুরী মিটিং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, জাদুঘরে সংরক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিলাদি ও উপাত্তসমূহ রয়েছে, তা ন্যাশনাল আর্কাইভস এ স্থানান্তর করা হবে। এতে আরো বলা হয় যে জাদুঘরকে আর্কাইভ সবগুলো দলিলের ফটোকপি করে একটা সেট সংরক্ষণের নির্মিত্তে সরবরাহ করবে। সেই লক্ষ্যে ফটোকপির কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আজ অবধি এগুলো জাদুঘরেই রয়েগেছে।

সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে নতুন একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের সকল কার্যক্রম এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- মুবিম/ পরি:/ প্রকল্প/ দলিল ও ইতিহাস/ ০২/ ১৫৭ তারিখ ০৫/ ১০/ ২০০২ইং ভিত্তিতে জানা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র নতুন করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। ইতি পূর্বে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পদিত, স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের পরিমার্জিত সংস্করনের জন্য জানুয়ারী ১৯৯৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৯ মেয়াদে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত প্রকল্পটি বাংলাএকাডেমীতে স্থানান্তরের অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে বাংলাএকাডেমী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রনয়ণ ও প্রকাশ শীর্ষক অপর একটি প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ০৮/ ০৯/ ৯৭ইং তারিখে প্রি-একনেক এর বৈঠকে এই প্রকল্পের প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। কিন্তু উপরে উল্লেখিত প্রকল্প দুটিকে একত্রিত করে ২৭/ ০৫/ ১৯৯৯ইং তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ শীর্ষক একটি প্রকল্প পাশ হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৯.৮২ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয় এবং ২০০২ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ধার্য্য করা হয়। ২৭/ ৫/ ১৯৯৯ইং তারিখের অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলাএকাডেমীর উপর। ২৪/১০/২০০২ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রণালয় "মুক্তিযুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক মন্ত্রণালয়" গঠিত হওয়ার পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় অত্র মন্ত্রণালয়ের উপর। বাংলাএকাডেমী থেকে প্রকল্পের সকল পরিসম্পদ গুলো ২০০২ সালের জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রকল্পটির সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার ৯ সদস্যের প্রত্যয়ন কমিটি গঠন করেন। ১৬/ ১০/ ২০০২ইং তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব রেদোয়ান আহমদ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ শীর্ষক প্রকল্পের নবগঠিত প্রত্যয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রত্যয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হলেন:

১. জনাব রেদোয়ান আহমেদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২. প্রফেসর এম, মুনিরুজ্জামান মিয়া

৩. প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

৪. ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

৫. ডঃ কামালউদ্দিন সিদ্দিকী

৬. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

৭. প্রফেসর কে এম মোহসীন

৮. প্রফেসর আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ

৯. প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমদ

এই প্রকল্পের মেয়াদ কাল ধার্য্য হয়েছে ৩ বৎসর এবং প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১১.২৩ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৯১টি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ খন্ডে দলিলগ্রন্থ, ৬৪টি জেলার ইতিহাস গ্রন্থ ও অন্যান্য ৮টি যথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, নারী, প্রবাসী বাঙালী, শিশু ও কিশোর, মুজিব নগর সরকার, বর্হিবিশ্ব ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর সচিত্র অ্যালবাম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খন্ড পুনমুদ্রণের সিদ্ধান্ত হয় এবং বাকী ৪ খন্ড বিবেচ্য প্রকল্পের অধীনে প্রনয়ণ ও প্রকাশ হবে বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে রক্ষিত স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিলসমূহ জাদুঘর কতৃপক্ষ সংরক্ষণের জন্য ডি এফ পি থেকে নিয়ে আসেন এবং তারা নিজস্ব সিরিয়াল নম্বর দিয়ে একটি তালিকা তৈরী করেন। পরবর্তীতে সেই তালিকাগুলোর ১০০ পাতা করে মোট ১১ টি ক্যাটালগ তৈরী করা হয়েছে। এই ক্যাটালগে ফাইলের বিষয়বস্তু ও পাতার সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। এই ক্যাটালগগুলো দেখলেই ১০০০ ফাইলের বিষয়বস্তু সর্ম্পকে একটি ধারণা পাওয়া যায়। গবেষকদের কাছে এই তালিকার মূল্য অপরিসীম। এই তালিকা দেখে গবেষকরা তাদের প্রয়োজনীয় ফাইল থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। তালিকাটি অবশ্য কার্বনকপি করা অবস্থায় আছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় লোকবল ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে এই তালিকাটি ক্যাটালগ আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অনেক গবেষকবৃন্দ অভিযোগ করে থাকেন যে তালিকাগুলো বাক্সবন্দী হয়ে জাদুঘরে পড়ে আছে যা গবেষকদের কোন কাজে আসছে না; কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। গবেষকদের গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ নিয়ম মাফিক তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের যে দলিল গুলো জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। সে দলিলের ১১ টি তালিকার মধ্য থেকে উল্লেখ্য যোগ্য কিছু দলিলের বিবরন দেওয়া হলোঃ

তালিকা : ১

১. বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে লন্ডন, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কিত- পৃ- ১৯, বা জা জা নং ১৫

২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত স্মারকলিপির ফটোকপি- পৃ- ৪, বা জা জা নং ৩৭

৩. মুজিব নগর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা চিঠিপত্র এবং নামের তালিকা। পৃঃ ৪২, বা. জা.জা. নং- ৮৫

৪. মুজিব নগর সরকারের দলিলপত্র।

অস্থায়ী রাস্ট্রপতির চিঠি/ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের ভাষণ/ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/ দলিলপত্র।
পৃঃ ৪৪/ বা জা জা নং-৮৭।

৫. (ক) গণবাহিনীর অধিকৃত অস্ত্র সম্পর্কিত পৃ- ৮৯, বা জা জা নং ২২

(খ) Bangladesh Armedforce ইস্যু রেজিস্ট্রার, জীর্ন- ১

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা : ২

১. মুজিব নগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালযের ও দফতরের যোগাযোগ সংক্রান্ত পত্রের ফটোকপি। পৃ- ৯৭, বা জা জা নং ১৫৫-১৫৯

২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (মুজিব নগর) এর সাথে স্বাধীন বাঙলা বেতারের সাথে পত্রে যোগাযোগের ফটোকপি, পৃ-১১৭, বা জা জা নং ১৭৫।

৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সর্ম্পকিত কাগজপত্রে ফাটোকপি পৃ ১৯৭ বা জা জা ১৭৭।

তালিকা : ৩

১. মুক্তিযুদ্ধের অপারেশন'৭১ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধভিত্তিক গেরিলা তৎপরতার দলিল। পৃ- বা জা জা.নং ২৯৮।

তালিকা : ৪

১. স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ঘটনার প্রতিবেদন বা সাক্ষাৎকার পৃ- ১০ বা জা জা ৩৫৬।

২. মুক্তিবাহিনীর সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম বিভাগ পৃ ১১৬ থেকে ১১৮ বা জা জা নং ৩৬২-৩৬৫।

৩. মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কারসাজি রাজাকার,আলবদর আল শামস এর ভূমিকা ও জনগণের প্রতিক্রিয়া, পৃ- ১১৫, বা জা জা ৩৬৬।

৪. স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি সর্ম্পর্কিত বিবরণী। পৃ ১২৯ বা জা জা ৩৭৫।

৫. ভারতীয় সীমান্তে শরণার্থীদের অবস্থা এবং ভারতে মুক্তিবাহিনীর সামরিক শিক্ষা প্রসঙ্গে, পৃ- ১৩২ বা জা জা নং ৩৭৮।

৬. মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন প্রদানের কাগজ হাতের লেখা, পৃ- ২ বা জা জা ৩৮০।

৭. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান বিষয়ক মর্নিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের হাতে লেখা খসড়া, পৃ- ৪১ বা জা যা নং ৩০২।

৮. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার লিখিত খসড়া অনুলিপি, পৃ-৪৮ বা জা জা নং ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯. মুক্তিযুদ্ধের উপর সংগৃহীত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, হাতে লেখা, জীর্ন অবস্থায়, পৃ- ৩৪৮ বা জা জা নং ৩১৩।

১০. সাক্ষাৎকারঃ মেজর জেনারেল চিত্তরঞ্জন দত্তের (বীর উত্তম) বাংলায় হাতের লেখা (ফটোকপি) , পৃ- ১০৪ বা জা জা ৩১৯।

১১. সাক্ষাৎকার কর্ণেল মাহফুজুর রহমানের হাতের লেখা ফটোকপি, পৃ- ১৪০বা জা জা নং ৩২০।

১২. সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিবরণ, পৃ-১১৪ বা জা জা ৩৩২।

১৩. ভারতীয় সীমান্তে শরনার্থীর অবস্থা এবং ভারতে মুক্তিবাহিনীর সামরিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবরনী, বিক্ষিপ্ত পাতায়, হাতের লেখা, পৃ- ২২ব া জা জা নং ৩৭৮ বগুড়া।

১৪. মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন প্রদানের কাগজ হাতে লেখা, পৃ-২ বা জা জা নং ৩৮০।

১৫. ডিসেম্বরের যুদ্ধে জনগনের প্রতিক্রিয়া। হাতে লেখা, বিচ্ছিন্ন পাতায়, পৃ- ৩ বা জা জা নং ৩৮১ রংপুর।

১৬. মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ, জনগনের সার্বিক সহযোগিতা ও গেরিলা বাহিনীর সাফল্যে, বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ (জা স্বা ই পরি) এর প্যাডে
হাতে লেখা, পৃ-২৯০ বা জা জা নং ৬৯৮ খুলনা।

১৭. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি (জা স্বা ই পরি) এর প্যাডে হাতে লেখা, পৃ- ৩৮২বা জা জা নং ৪০০।

তালিকা : ৫

১. বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদস্য, সেনাবাহিনীর সদস্য, একজন ক্যাপ্টেনের স্ত্রী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মুক্তিযুদ্ধ চালাকালীন অভিজ্ঞতার হাতে লেখা, পৃ- ১০৬ বা জা জা নং ৪০২।

২. কায়েমী শোষক গোষ্ঠির চক্রান্তের বিরুদ্ধে একটি পত্র, পৃ- ১ বা জা জা নং ৪২০।

৩. BNR সর্ম্পকীত ষ্টেইনসীলকৃত ও নোটশীট, পৃ ৮৯ বা জা জা নং ৪৩১।

৪. ICA Aid Pragramm Pak police Force সংক্রান্ত কাগজ পৃ-৩ বা জা জা নং ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এম.আর আখতার মুকুলের চরমপত্র পান্ডুলিপি ক্রয় সংক্রান্ত নথি,পৃ-৫ বা জা জা নং ৪৭০

৬. স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ ১ম ও ২য় খন্ডের প্রেসকপির ডুপ্লিকেট, পৃ-২২৫ বা জা জা নং ৪৭১।

৭. মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের বিভিন্ন প্রেস কপি যেমন ২,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১৪,১৫ এর তালিকা এই ক্যাটালগে রয়েছে।

৮. স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র; ৯ম ও ১০ম খন্ডের প্রেস কপি, পৃ-৯৫ বা জা জা নং ৪৭৩।

তালিকা : ৬

১. মুক্তিসংগ্রাম চাঁদা আদায়ের রশিদ জীর্ণ ও ছেঁড়া, পৃ-১০ বা জা জা নং ৫১।

২. প্রকাশিত খন্ডের ভলিউম পরিকল্পনা সর্ম্পকৃত খসড়া- হাতের লেখা ও টাইপ কপির ফটোস্ট্যাট কপি, পৃ- ১৫ বা জা জা নং ৫১৯।

৩. মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ, জনগণের সার্বিক সহযোগিতা এবং গেরিলাদের সম্পর্কে বিবরণী। হাতে লেখা ও টুকরা কাগজ,পৃ-২৩০ বা জা জা নং ৫৬৬ চট্টগ্রাম।

৪. মুক্তিযোদ্ধাদের চাঁদা আদায়ের খাতা ২টি বাঁধাই করা ছোট সাইজ, বা জা জা নং ৫৬৮।

৫. চট্টগ্রামের কয়েকজন ব্যক্তির মুক্তিযুদ্ধ/ অসহযোগ আন্দোলনের উপর সাক্ষাৎকার, টুকরা বিচ্ছিন্ন ও টুকরা কাগজ সহ, পৃ-১২৫ বা জা জা নং ৫৬৯।

তালিকা : ৭

১. ইন্ডিয়ান প্রোপগান্ডা ইন পাকিস্তান থ্রু ... নিউজ পেপার, পৃ-১৮ বা জা জা নং ৬১৫ BNR।

২. জুলফিকার আলী ভুট্টো এর বক্তৃতা ও বিবৃতি, পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ বিশেষ, পৃ-১৭ বা জা জা নং ৬৪৯।

৩. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত, পৃ-২৯৮ বা জা জা নং ৬৬০।

৪. (ক) মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট ইস্যু রেজিষ্টার। ১- ৪৬ পৃ।

(খ) মুক্তিবাহিনীর তালিকা রেজিষ্টার। ১- ১৭২ পৃ বা জা জা ৬৬১।

৫. সাক্ষাৎকার বৃহত্তর রংপুর জেলা - ১৬ (ষোল) জনের, পৃ-৪২ বা জা যা নং ৬৬৯।

৬. মুজিব নগরে অস্থায়ী রাজধানী সংক্রান্ত নথি, পৃ-৩১০ বা জা জা নং ৬৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন আদেশ/ নির্দেশ নিয়োগপত্রের ফটোকপি। বাংলা ও ইংরেজীতে, পৃ-৫০ বা জা জা নং ৬৮৬।

তালিকা ঃ ৮

১. (ক) ওয়াশিংটন ডিসি থেকে এ্যানাটেলর কর্তৃক প্রেরিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন পত্র এবং উত্তরসমূহ ফটোকপি।

(খ) বাংলাদেশের সমর্থনে মার্কিন সরকারের নিকট দাবী সম্বলিত পিটিশন মার্কিনীদের স্বাক্ষর যুক্ত, পৃ-১৭৮ বা জা জা নং ৭০২, ফটোকপি।

২. মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা সংক্রান্ত তথ্য, হাতে লেখা, পৃ-১৪২ বা জা জা নং ৭২৫।

৩. ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে প্রকাশিত পত্রের ফটোকপি, পৃ-২০০ বা জা জা নং ৭৭৬।

৪. লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের ও অন্যান্য কাগজ পত্র, পৃ-২১ বা জা জা নং ৭৭৯ মূল ও ফটোকপি।

তালিকা : ৯

১. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ বেঙ্গল রেজিমেন্টদের অস্ত্র শস্ত্রের তালিকা। হাতের লেখা ও টাইপ করা, পৃ-১৮ বা জা জা নং ৮৭৫।

২. ৬ নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা। হাতের লেখা ইংরেজী ১৬ পৃ।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের আবেদন পত্র হাতে লেখা জীর্ণ, পৃ-৬০ বা জা জা নং ৮৬১।

৪. কুড়িগ্রামের শান্তি কমিটির তথ্য, পৃ-১১ বা জা জা নং ৮৬২।

৫. পটুয়াখালি জেলার রাজাকার আলবদর ও শান্তি কমিটির লোকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা বাংলা একাডেমী ফাইল ৭৩ বা জা জা নং ৮৫৪।

৭. মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিবরন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (জাতীয় স্বাধী ইতি পরি) এর পড়ে হাতে লেখা, পৃ-১৯৫ বা জা জা নং ৮৫৫।

৮. রাজাকার আলবদর, আল শামস প্রভৃতির ভূমিকা ও জনগনের প্রতিক্রিয়া। বরিশাল থেকে সংগৃহীত; হাতে লেখা, পৃ- ৫১ বা জা জা নং ৮৭১।

৯. (ক) রাজাকারদের সম্পর্কে বাধাই রেজিষ্টার ১টি (একপাতা লেখা)

Dhaka University Institutional Repository

(খ) শান্তি কমিটির সদস্যদের তালিকা, চিঠিপত্র টাইপ ও হাতে, লেখা টুকরা ও বিচ্ছিন্ন কাগজ পৃ-৩৫।

(গ) দালালদের সহায়তার পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক আহত ও নিহতদের তালিকা ২ পৃ মোট (১+৩৫+২)= ৩৮ পৃ বা জা জা নং ৮৭২।

তালিকা ঃ ১০

১. মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার - ৪৮ (আটচলিশ) জনের, পৃ-২০৯ বা জা জা নং ৯১৬।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসমরিক প্রশাসন, পৃ-৭৩ বা জা জা নং- ৯৯৪।

৩. (ক) লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির কাগজপত্র টাইপ কপি ।

(খ) লন্ডনস্থ বাংলাদেশ কনভেশন কমিটির কাগজ পত্র ফটোকপি, পৃ-৮৫ বা জা জা নং ৯৮৮।

৫. কার্যরত গেরিলাদের তালিকা ফটোকপি কপি, পৃ- ৭৫ বা জা জা নং ৯১১।

৬. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাক্ষাৎকার ২৯ জনের নিকট থেকে প্রাপ্ত এলোমেলো, পৃ- ১০২ বা জা জা নং ৯১২।

৭. (ক) 59th Inter Parliamentary Conference 3 (three) Copies – ৩০পৃ।

(খ) বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ফটোকপি ৪২ পৃ।

(গ) মুজিবনগর সরকারের আদেশপত্র ও অন্যান্য ফটোকপি পৃ-৪০ বা জা জা নং ৯৬৩।

৭. স্বাধীনতা সার্বভৌম রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখাও কর্মসূচী বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির ছাপা পৃ- ১।

তালিকা ঃ ১১

১. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারত থেকে প্রকাশিত পত্রিকার কাটিং, পৃ-৪০ বা জা জা নং ১০০৭।

২. বিশ্ব মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার কাছে মুক্তিযুদ্ধের সময় লিখিত পত্রাবলী এবং পত্রদাতাদের নামের তালিকা, পৃ-২৩৫ বা জা জা নং ১০২৯।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার বিবরণ, পৃ-৯৯ বা জা জা- ১০৩২।

৪. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা পত্র পত্রিকার তথ্য ও চিঠিপত্র (টাইপ, ফটোকপি ও হাতের লেখা) রাজাকারের সার্টিফিকেট ৪টি সহ মোট, পৃ-২৪২ বা জা জা ১০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে (ডিসেম্বর ৭১) জনগণের প্রতিক্রিয়া ও ভারতীয় সৈন্যের সাফল্য বিষয়ক কাগজ পৃ- ২১ সিলেট বা জা জা নং

৬. ইয়ুথক্যাম্প সংক্রান্ত কাগজ পত্র ফটোকপি, পৃ- ৬৪ বা জা জা নং ১০৬২।

৭. ভারতীয় উপমহাদেশে সংকট থেকে মুক্তির পথ ফটোকপি Mrs Gandhi Visit to Moscow on 4/10/71 পৃ- ১১ বা জা জা নং ১০৮৯।

৮. Mujib Nagar Govt, Official Letter, Agenda, War campaign letter, Photocopy, Page- 36 বা জা জা নং ১০৯০।

৯. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল (গোপনীয়) পত্রের ফটোকপি ক্যাবিনেট মিটিং/ টপসিক্রেট, পৃ- ১৬ বা জা জা নং ১০৯১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় হলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন। মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন বিষয়ক আলোচনার প্রথমেই এসেছে মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রগুলো Unaccession বা সংগ্রহ বর্হিভূত নিদর্শন। ১৯৪৮ সালের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দাবী থেকে '৭১ এর আত্নসর্ম্পনের ধারাবাহিক আলোকচিত্র জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই আলোকচিত্রগুলোর বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোন কোন আলোকচিত্র গণহত্যা বিষয়ক, আবার কোন কোন আলোকচিত্রে, পাকবাহিনী নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করে, কোন আলোকচিত্র দেখা যাচ্ছে মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়েছে। আবার ভারতের শরণার্থী শিবিরের আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে রয়েছে। এই জাতীয় আলোকচিত্র সমূহে বাংলার মানুষের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। পাকবাহিনীর নির্যাতনে প্রাণের ভয়ে বাংলার মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহহীন হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রিত ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থানের ফলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে যে মানবেতর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, আলোকচিত্রে সে অবস্থাকে তুলে ধরে রেখেছে। আর কিছু আলোকচিত্রে দেখা যায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধা। এই জাতীয় আলোকচিত্রগুলো বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধারাই যুদ্ধকালীন নয় মাস বাঙ্গালীকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছে। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রগুলোই ইতিহাসের নিরব সাক্ষী হয়ে থাকবে। আমাদের আগামী প্রজন্মকে জানাবে বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতার ইতিহাস।

নিদর্শন ভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে পোষ্টারের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পোষ্টার ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। কিছু কিছু পোষ্টার অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন : The concert for Bangladesh, Help Bangladesh, Bangladesh Needs your Help.

জাদুঘরে প্রদর্শিত পোষ্টারগুলোতে স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিটি পোষ্টারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কোন কোন পোষ্টারে মানুষের আবেগ আবার কোন

Dhaka University Institutional Repository

পোষ্টারে যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, তবে সবগুলো পোষ্টারের মূলমন্ত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তানীদের নয় মাসের ধ্বংস ও হত্যার মধ্য দিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের। এই পোষ্টারগুলোর মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। যে কোন যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হলো অস্ত্র। অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ অসম্ভব। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিরোধে অস্ত্রের পরিমান ছিল অপ্রতুল। অবশ্য পুরো নয় মাসের যুদ্ধে সময় অস্ত্রের দিক দিয়ে আমরা কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম না। এ সর্ম্পকে Bangladesh নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে There were to begin with, at least 3,000 men of the East Bengal Regiment, some 12,000 E.P.R men, plus several thousand Mujahids and student volunteers. In most parts this ragtag force is world war 11,303 guns. Apart from a shortage of arms, the Muktifouz is also in need of elementary military training মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জাতীয় জাদুঘরে যুদ্ধে ব্যবহৃত তেমনি কিছু অকেজো অস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী (৪০নং) তে প্রদর্শিত হচ্ছে। এসব অস্ত্রের পাশাপাশি আরো উল্লেখযোগ্য কিছু অস্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। সেগুলো হলো উপজাতীয়দের তৈরী তীর, ধনুক হাতে তৈরী বন্দুক। মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতাল উপজাতীদের আন্তরিকতাপূর্ণ অংশ গ্রহণের স্মারক হিসাবে এগুলো গ্যালারীতে প্রদর্শিত রয়েছে। বাঙ্গালী জনগনের পাশাপাশি উপজাতীরাও যে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তার দৃষ্টান্ত মেলে এই অস্ত্রে। জাদুঘরে প্রদর্শিত এসব স্মারক নিদর্শনগুলো বাঙ্গালী জনগণের ওপর বর্বর অত্যাচার ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ ও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে।

৭১ এ পুরো বাংলাদেশ জুড়েই ছিল বধ্যভূমি। তেমনটি উত্তর বঙ্গের কোন এক বধ্যভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল যাদুঘরে প্রদর্শিত মাথার খুলি। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর আত্মহুতির নীরব সাক্ষী হচ্ছে এই বধ্যভূমিগুলো। স্থানীয় রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় পাকবাহিনীরা মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের ধরে এনে গুলি করে, জবাই বা বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করা হতো। সারা বাংলাদেশের অজস্র গনকবরের স্মারক হিসাবে জাদুঘরের গ্যালারীতে মাথার খুলিগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক নিদর্শন হিসাবে জাদুঘরে প্রদর্শিত রয়েছে কিছু ব্যাজ ও স্টীকার্স। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করার ক্ষেত্রে এই ব্যাজ ও স্টীকার্স এর ভূমিকা ছিল ব্যাপক। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সার্বিক সহায়তার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীতে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সংস্থা। বিশেষ করে ভারত, যুক্তরাজ্য, ইউএসএসআর, আমেরিকা, কানাডা, ইন্দোনেশিয়াসহ সর্বত্র। এই সব কমিটিগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বপক্ষে এবং পাকবাহিনীর বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। সেকারণেই এই সব ব্যাজ স্টীকার্স লিফলেট ইত্যাদি বিদেশী জনগণের মধ্যে বিলি করা হতো। কিছু ব্যাজ বা স্টীকার্স এ লেখা আছে Help Bangladesh or Bangladesh needs your help এই জাতীয় ব্যাজ বা স্টীকার্সগুলোর বক্তব্য ছিল পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতা, অমানবিক হত্যাযজ্ঞে হাত থেকে বাংলার মানুষকে বাঁচানো। পাকবাহিনীর নির্যাতন ও বর্বরতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশ্বের মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ ছুটে এসেছিলেন।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে আমেরিকান ৪৫ জন সিনেটর ও ৩৫ জন কংগ্রেস সদস্য বাংলাদেশের ওপর নয়মাস বহু বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের ওপরে সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভে ১২টি রেজুলেশন হয়েছে। এই রেজুলেশন গুলো এনেছেন সিনেটর হ্যারিস, সিনেটর কেইস, সিনেটর ওয়ালটার মন্ডেল, সিনেটর ম্যাথাম, স্যাল ট্রেইজার, সিনেটর স্যাক্সবি সিনেটর কংগ্রেস ম্যান হেলটসকি; হিয়ারিং হয়েছে পাঁচটা।
প্রথম হিয়ারিং করেছিলেন গালাগার। তিনি ছিলেন এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স এর ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান তিনি ৭১ এর কলকাতায় এসেছিলেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে ১৫ মে এবং ২৫ মে প্রথম হিয়ারিং করেন। সিনেটর এডওয়ার্ড এস কেনেডি রিফিউজিদের উপর ২৮ জুন দ্বিতীয় হেয়ারিং করেন।

সিনেটর এডমড মাস্কি ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল সিনেটের বক্তৃতায় পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাবলিতে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেন এবং পাকবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের সোচ্চার হওয়ার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন দু'দেশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সাহায্য সংক্রান্ত সম্পর্ক এবং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি মিনেসোটার সিনেটর মি.মনডেল, ম্যাসাচুসেটসের সিনেটর মি.ব্রুক, এবং ওরিজনের সিনেটর মি. হ্যাটলিল্ড এর সঙ্গে যুক্তভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তারা পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ ও রক্তাক্ত ঘটনাবলীর সাথে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততার মাত্রা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তা ছাড়া সব ধরনের সামরিক সাহায্য স্থগিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন কে অনুরোধ জানান।

ফ্রান্সের আঁন্দ্রে মালরৌ এগিয়ে এসেছিলেন পূর্বপাকিস্তানের মুক্তিকামী বাঙ্গালীদের পাশে। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে লেখা এক খোলা চিঠিতে উল্লেখ করেন, "আপনার বিমানবাহী জাহাজ কলকাতাকে হুমকি দিতে সক্ষম হলেও যুক্তরাষ্ট্র ঐ সব সমবেত মৃত্যুকামী জনগণের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করে পেরে উঠবে না। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আপনার সেনাবাহিনী যেখানে ভিয়েতনামের নগ্নপদ যোদ্ধাদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আপনি বিশ্বাস করেন যে, ১২০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলামাবাদের সেনাবাহিনী একটি দেশকে কোনাদিন দখল করতে পারবে"[১]?

মার্কিন সেনেটর আদলাই স্টিভেনলস ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকায় তার সংক্ষিপ্ত সফর শেষে বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতার উল্লেখ করে বলেন "ইতিহাসে এটি একটি নজিরবিহীন কালো অধ্যায়"[২]।

তবে ঢাকায় অবস্থানরত কিছু কিছু মার্কিন নাগরিক পাকবাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল এবং পাকবাহিনীকে গণহত্যায় সহায়তা প্রদান করে। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নামের সাথে হগহাইটের নাম জড়িত ছিল। ঢাকার একটা দৈনিক পত্রিকায় রাওফরমান আলীর ডেস্ক ক্যালেন্ডারের একটি পাতা ছাপা হয়, সেখানে হগ হাইটের নাম লেখা ছিল। এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই হাইট বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। ইউনাইটেড প্রেসের আরনলড জেটলিন বলেন ক্যালেন্ডারের পাতায় হাইট সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর উল্লেখ ছিল, যাতে প্রমান হয় হাইটের সাথে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি যোগসূত্র রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নিউইর্য়ক টাইমস পত্রিকায় বলা হয়েছে, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর পরাজয় একই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যেও একটি পরাজয়। পত্রিকাটিতে আরো বলা হয় আমেরিকার এই দুর্গতির ফলে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ আমেরিকার প্রতি তাদের বিশ্বাস হারাবে।

১। সোহরাব হাসান সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা পৃ-৫৭
২। ঐ, পৃ ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন ব্যাজ এ লেখা আছে Freedom and Relief For the People of East Bengal এই জাতীয় ব্যাজে বাঙ্গালীর অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। জাদুঘর এই স্মারকগুলো ধরে রেখেছে এবং যুগ যুগ ধরে এগুলো কালের সাক্ষী হিসাবে প্রদর্শিত হবে বিশ্ববাসীকে জানাতে থাকবে আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতার ইতিহাস। এদিক দিয়ে এই স্মারকগুলো ইতিহাসের উপাদান হয়ে থাকবে। জাদুঘরে প্রদর্শিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পিলার। '৫২ গৌরবময় বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাসহ বাঙ্গালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্বিক ইতিহাসের বাহক হিসাবে পিলারটি গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

জাদুঘরের নিদর্শন হিসাবে সংগ্রহভূক্তির পথে রয়েছে ভিনদেশী বীর মুক্তিযোদ্ধা উইলিয়াম অব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড এর নিদর্শন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই যোদ্ধা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তিনি এক বিবেকবান ও জাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৈনিক। জীবন দর্শনের মৌল চেতনা থেকেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে। বাঙালী জাতি তাই তাকে সম্মানিত করেছিলো "বীর প্রতীক" উপাধীতে। এই বীর প্রতীকের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহকে যেমন একদিকে সমৃদ্ধ করবে তেমনি ভাবে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার নাম হয়ে থাকবে চিরঞ্জীব। জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনগুলো তার কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে আমাদের উত্তরসূরীরা জানবে এই ভিনদেশী বীরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা।

মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন গুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসাবে জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে পীড়ন যন্ত্র। ৭১ এর মুক্তি সংগ্রামে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত বহন করে এই পীড়ন যন্ত্রটি। এই পীড়নযন্ত্রটি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ব্যবহৃত হয়েছিল। একটা উদাহরন থেকে এর ভয়াবহতার বিবরন পাওয়া যায়, তৎকালীন চট্টগ্রাম জি পি ও এর অবসর প্রাপ্ত স্টাফ জাহারুল ঈমান চৌধুরী কে অবাঙালী পোষ্ট মাষ্টার এ. বি মস্তান ডেকে পাঠান। তৎকালীন জিপিওতে কর্মরত জ্যোতি বড়ুয়া, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সহ জনাব ঈমানকে গ্রেফতার করে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজ নিয়ে যাওয়া হয়। সার্কিট হাউজে তিনি আরো কিছু বাঙ্গালীকে বন্দী অবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে পান। আগষ্টের ৭ তারিখে জনাব ঈমান ও জনাব হাকিমকে ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতন শিবিরে নিয়ে গিয়ে বেতমারা কিল, ঘুষি, থাপ্পর, সহ উলঙ্গ করে ইলেকট্রিক শক দেওয়া সহ সব ধরনের নির্যাতন চালানো হয়। প্রায় মাসব্যপি এই নির্যাতন চালানো হয়। পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার বাস্তব ঘটনা মধ্যেযুগের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। হত্যা, লুট, নির্যাতন, নারীধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞের নিকৃষ্টতম নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই বলতেই চলে। পীড়ন যন্ত্রটি পাকবাহিনীর এই নিষ্ঠুরতার পরিচয়ই বহন করছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত এই যন্ত্রটি সমগ্র মানব সমাজে পাকবাহিনীর হিংস্রতার ইতিহাস তুলে ধরেছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নং গ্যালারীর শেষ দেওয়ালে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা এবং এর নিচেই প্রদর্শিত হচ্ছে আত্মসর্ম্পনের টেবিল। একটা দেশ ও জাতীর সার্বভৌমত্বের প্রতীক হলো সে দেশের পতাকা। ১৮ এপ্রিল '৭১ বাংলাদেশ মিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী ও তার সহকর্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় এই পতাকাটি উত্তোলন করা হয় । পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, বহু দেশী বিদেশী সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফারদের সামনে বাংলাদেশ মিশনে উত্তোলন করা হয়। কলকাতার ৯নং সার্কাস এভিনিউতে বাংলাদেশ মিশন, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান কূটনৈতিক কার্য্যালয়ে পরিণত হয়। ভারতবর্ষ সহ সমগ্র বিশ্বে এই উত্তোলিত পতাকার সংবাদ রেডিও, পত্রপত্রিকায়ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ৭১এর ৯ মাস প্রতিটি বাঙ্গালীর মধ্যে সাহস সঞ্চার করেছে বাংলাদেশের এই পতাকাটি। বাংলাদেশ মিশনে উত্তোলিত এই পতাকাটি আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। তেমনি ভাবে প্রদর্শিত আত্মসর্ম্পনের টেবিলটিও বাঙালীর গৌরবময় স্বাধীনতার ইতিহাসের বাহক হিসাবে দন্ডায় মান রয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে আমি মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছি জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনের এবং ভবিষৎ প্রজন্ম এর কাছে মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ ইতিহাস তুলে ধরতে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

জাদুঘরে প্রদর্শিত '৭১' গণহত্যার আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে প্রদর্শিত ৭১' আত্মসমর্পনের আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে প্রদর্শিত '৭১' গণহত্যার আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে প্রদর্শিত ৭১'গণহত্যার আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে প্রদর্শিত ৭১' মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

BANGLADESH বাংলাদেশ

৭১' লন্ডন থেকে পকাশিত বাংলাদেশের স্ট্যাম্প

Dhaka University Institutional Repository

To
Mr. Anwar Faridi
Member Secretary
Dhaka City Committee
Freedom Fighters Cultural Command
C/O, Rafter Bangladesh
119 Aziz Super Market (Ground Floor)
Shahbag, Dhaka-1000, Bangladesh

Dear Mr Faridi,

Thank you for your letter of January 24, 1997 advising your efforts to gather and preserve for the future generations of Bangladesh, relevant and vital information and Facts about the struggle of the Bengali people for freedom and independence, commencing in 1971.

As one who was intimately involved in this struggle. I am writing to give you the information you requested. firstly concerning myself and then to share with you some recollections of the 1971 struggle.

I was born on December 1917 in Amsterdam. Holland While Europe was in the grip of the third year of the first world war. I was conscripted for national service in 1936 shortly after I had commenced my employment with the Bata Shoe Company. Shortly before my motherland was invaded by Germany. I was called up to serve as a sergeant in the Dutch Royal Signals Corp. In the face of the might of Adolph Hitler's German junta, equipped with sophisticated tanks and other massive

Dhaka University Institutional Repository

weapons. My platoon of 36 men then were simply armed with short rifles and 12 rounds of ammunition each. As we went out to face this enemy, flying overhead was the huge fleet of German warplanes headed for Rotterdam where, in the space of half an hour, 30,000 innocent Dutch citizens died as a result of their massive air attack. Following this blitzkrieg of Rotterdam the German junta issued an ultimatum to the other cities of Holland, Belgium and France. Within weeks, the Dutch, Belgium and the French people were under the domination of the German junta.

Having escaped from the POW camp after a short internment. I joined the Dutch underground assistance movement. As I spoke fluent German and several Dutch dialects, I befriended the German High Command and was thus able to help the Dutch underground movement as well as the Allied Forces with vital information. So when the events of March 1971 started with tanks of the Pakistani forces rolling into Dhaka. I was reliving my experience of my younger days in Europe. I could fully appreciate and understand the predicament of the bengali people and this motivated me to spring into action on their behalf.

As a result of indiscriminate and cruel actions of this invading Pakistan Junta, thousands of Bengalis died in the ensuing weeks. I felt that someone had to make the world aware of what was happening Since I was able to move around freely. I was able to photograph the atrocities committed by the Pakistanis against the innocent people- Which included young children. I was then able to pass these photos to the World press to highlight the plight of the Bengali people.

Deeply touched and moved by the almost unbearable suffering and atrocitics I witnessed of the cruel and oppressive

Dhaka University Institutional Repository

occupying force. I secretly began an guerrilla movement with the brave Bengalis at Bata Tongi and all around Sectors 1 and 2. In addition, and as an expatriat CEO of an international company, I had the company of the occupying Pakistain High Command. This enabled me to help the Bengali freedom fighters I trained and worked with in relation to their guerrilla activities. All these actions were taken as a result of my deep love and affection I felt for the Bengali people.

There is much more that I could say in great detail but it is near impossible because I am now retired an almost blind.

I have enclosed an album of photographs cataloguing the atrocities of the occupying Pakistani army and the untold suffering of the Bengali people. Also included are photos of some of the brave freedom fighters whom I consider as my own sons.

I hope this will be of some help to your worthwhile endeavor and I wish you every success.

Yours Sincerely

W.A.S. Ouderland B.P.
5 Pete Crescent Trigg
Perth, Western Australia 6029
22 February 1997

Dhaka University Institutional Repository

৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

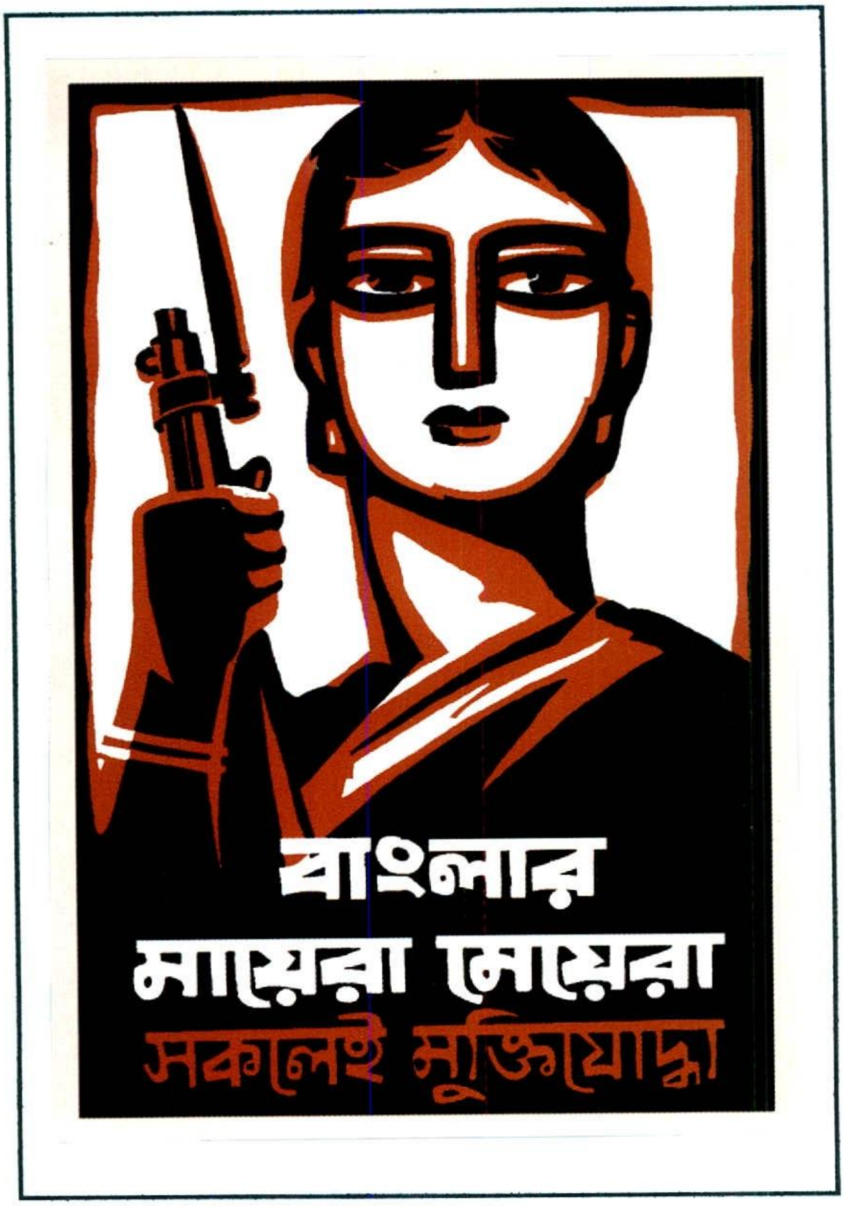

৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধের গ্যালারীর দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

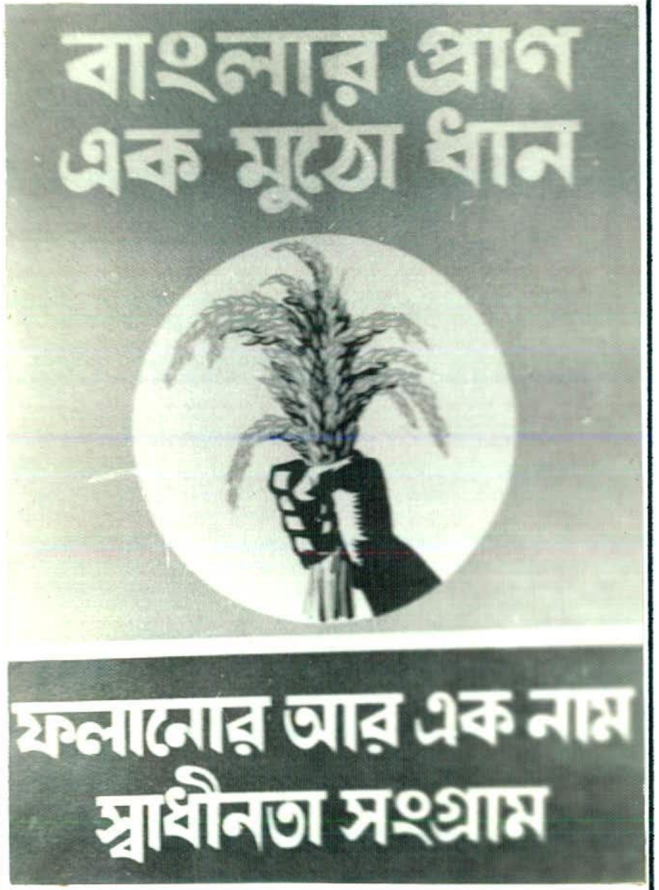

৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

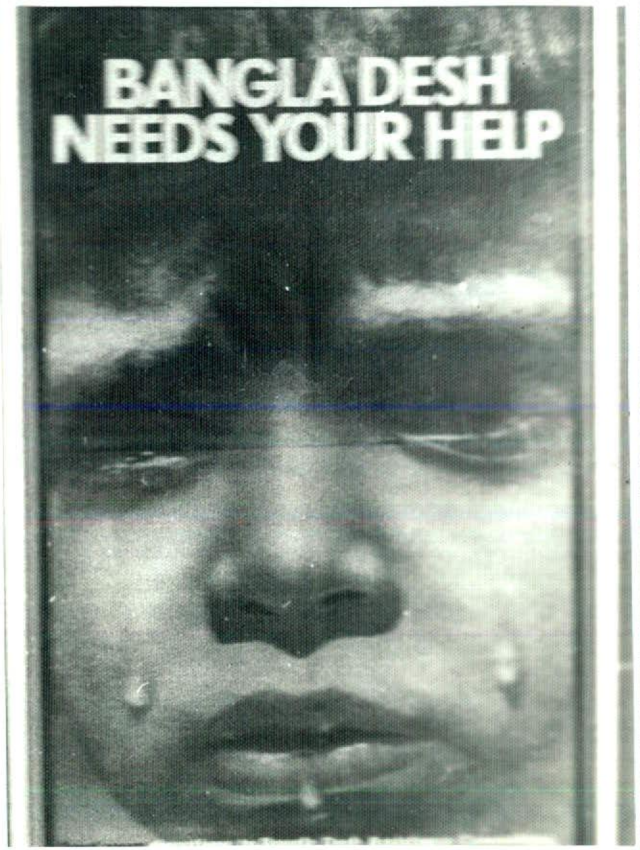

৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

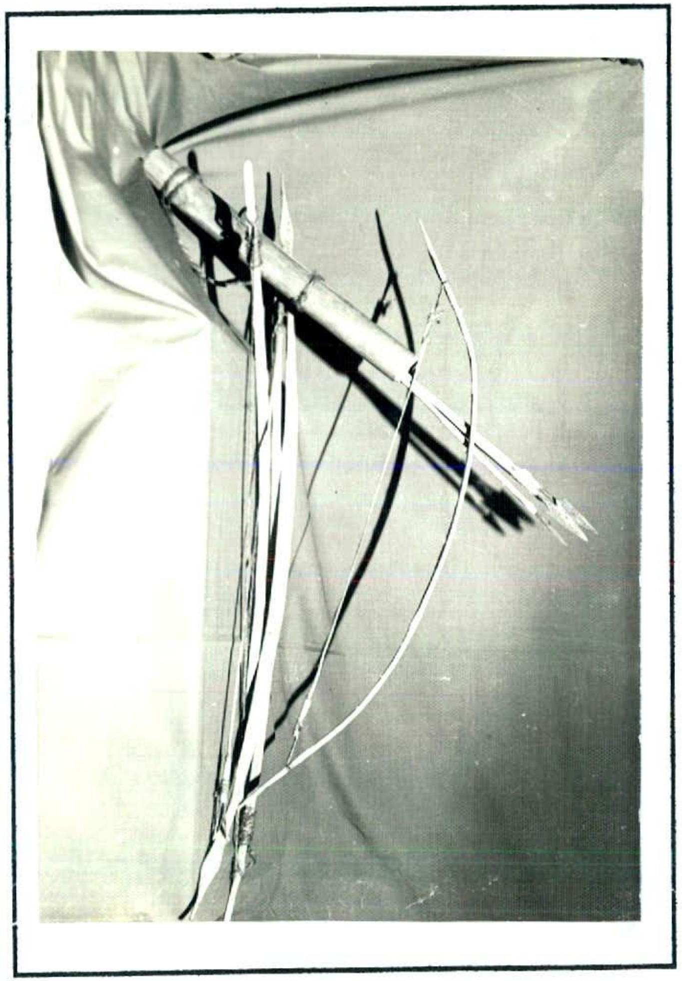

উপজাতীয়দের হাতে তৈরী তীর ধনুক

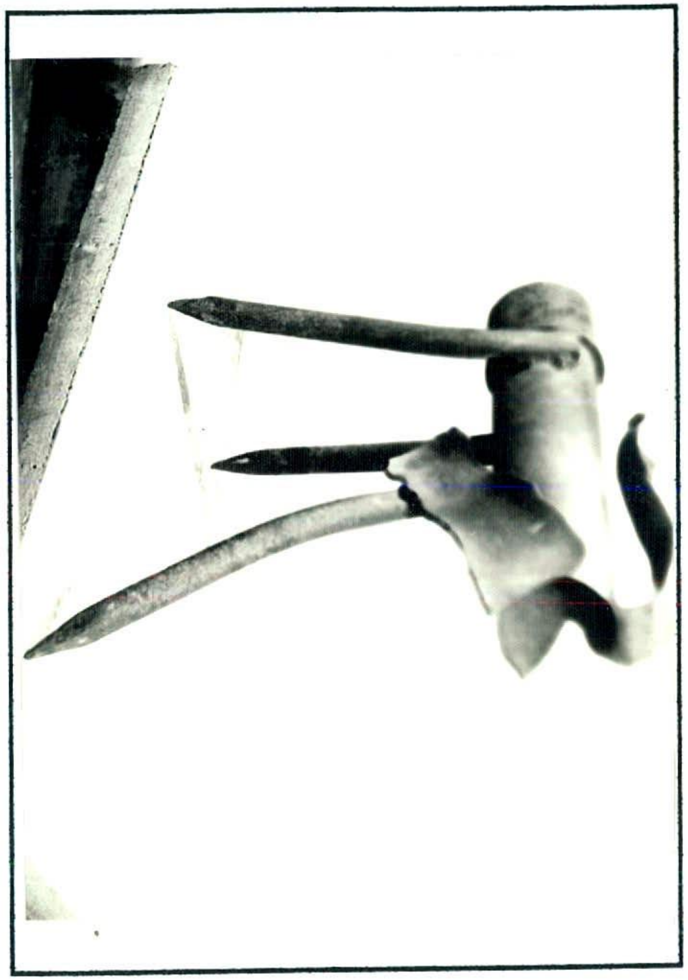

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তৈরী কামান

Dhaka University Institutional Repository

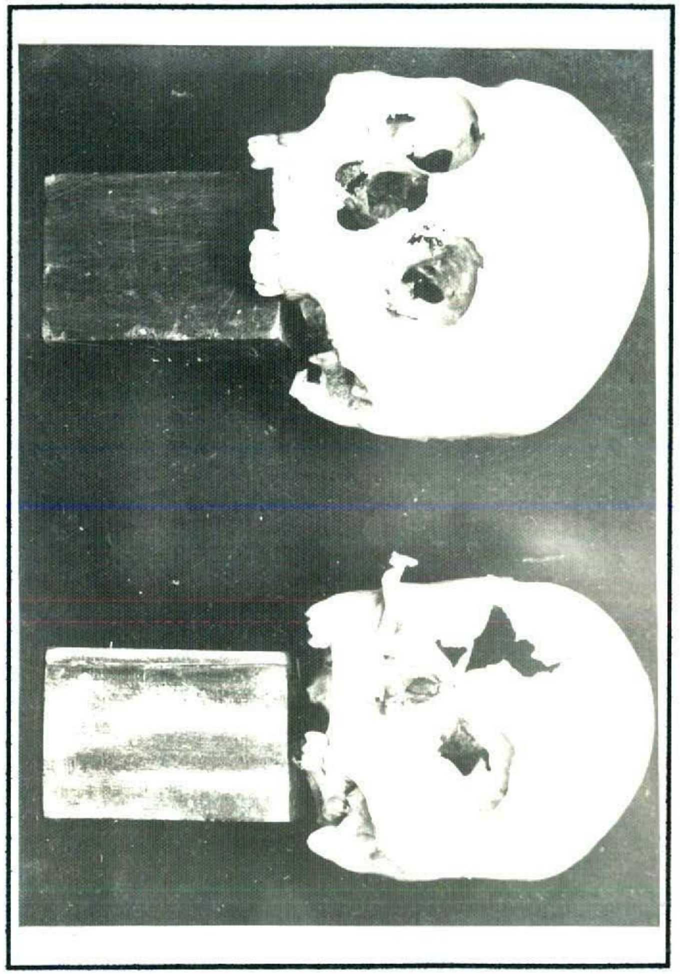

মাথার খুলি

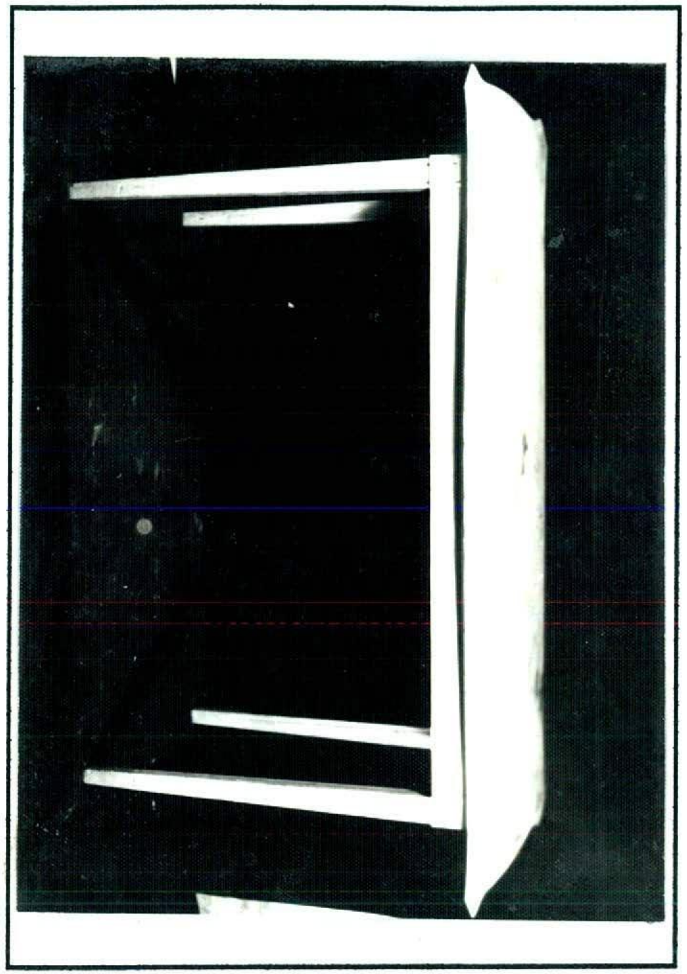

আত্মসমর্পনের টেবিল

Dhaka University Institutional Repository

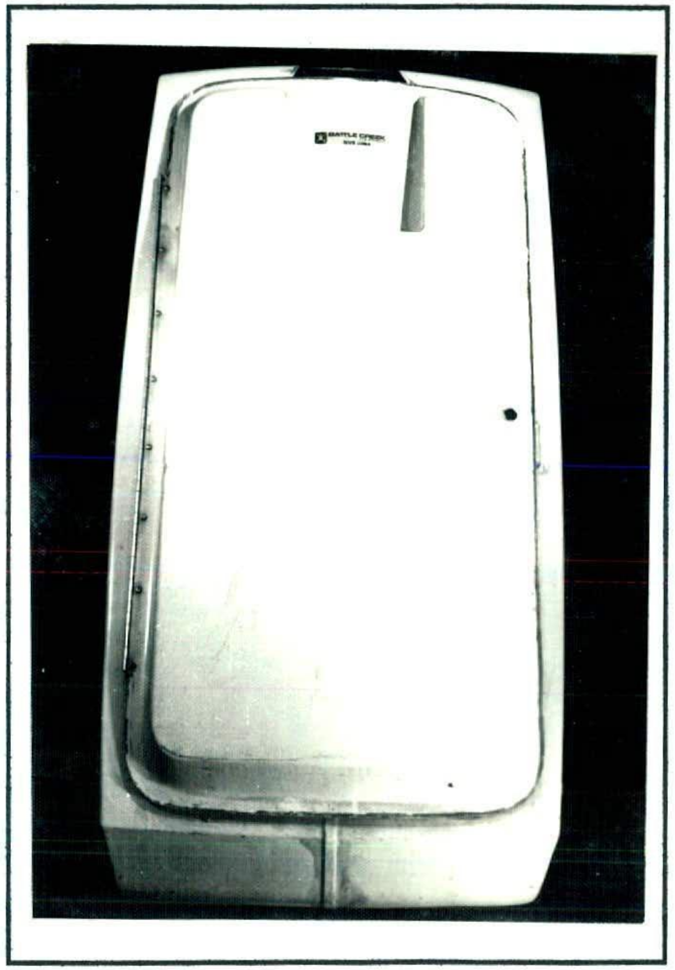

পীড়ন যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসমর্পনের দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

Dhaka University Institutional Repository

১৭। মাহফুজুর রহমান : বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে, চট্টগ্রাম- ১৯৯৩

১৮। মাহমুদউল্লাহ ও অন্যান্য (সম্পদিত) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র, ঢাকা- ১৯৯৯

১৯। মাঈদুল হাসান : মূলধারা'৭১, ঢাকা- ১৯৮৬

২০। মওদুদ আহমদ : বাংলাদেশ: স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা- ১৯৯২

২১। মুনতাসীর মামুন : ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা- ২০০১

: বাংলাদেশে ফেরা, ঢাকা- ১৯

২২। মুশতারী শফি : মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী

২৩। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত : ৭১' গণহত্যার দলিল, ঢাকা- ২০০০

২৪। রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম : লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, ঢাকা- ১৯৮১

২৫। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী : বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক, দলিল পত্র, ঢাকা-

২৬। রফিকুল ইসলাম পিএস সি (মেজর অব) : মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার, ঢাকা- ১৯৯৩

: নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা, ঢাকা-১৯৯৪

: মুক্তিযুদ্ধে তিন জন, ঢাকা- ১৯৯৪

: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা- ১৯৯৩

২৭। (মেঃ জে) রাও ফরমান আলী : একটি জাতির জন্ম, ঢাকা- ১৯৯৬

২৮। শক্তি চট্টপাধ্যায় সম্পাদিত : সাংবাদিকে চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা- ২০০২

২৯। সালাউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পদিত : বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ঢাকা-

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানা প্রসংঙ্গ ঢাকা- ১৯৯৭

৩০। সুকুমার বিশ্বাস : মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী, ঢাকা- ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস, ঢাকা- ১৯৯৬

৩১। এ কে এম সফিউল্লাহ (মেঃ জে অব:) : মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, ঢাকা- ১৯৯৫

৩২। সিদ্দিক সালিক : নিয়াজীর আত্ম সর্ম্পনের দলিল, ঢাকা- ১৯৮৮

৩৩। সোহরাব হাসান সম্পাদিত : বিদেশীদের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঢাকা- ১৯৯৯

৩৪। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ মেজর (অব) : রক্তেভেজা একাত্তর, ঢাকা- ১৯৯৭

৩৫। মোহাম্মদ হান্নান : ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ: ঢাকার রাজনৈতিক ইতিহাসের এ্যালবাম ঢাকা- ২০০১

৩৬। এম এ হাসান : যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষন, ঢাকা- ২০০১

৩৭। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত : স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিল১-১৫ খন্ড, ঢাকা- ১৯৯২

৩৮। হামিদুল হোসেন মেজর (অব) : জলছবি একাত্তর, ঢাকা-

৩৯। হারুন হাবীব : জনযুদ্ধের উপখ্যান, ঢাকা- ১৯৯৩

৪০। আনোয়ার ফরিদী সম্পাদিত : অতন্ত্র একাত্তর, ঢাকা- ১৯৯৭

৪১। Mufizulla Kabir : Experience of an Exile at Home, Dacca- 1972

৪২। M. A. Muhat : Bangladesh: Emergence of a Nation, Dacca-1973

৪৩। Rangalal Sen : Political alites in Bangladesh, Dhaka-1986

৪৪। Rounak Jahan : Pakistan failure in National Integration, New York -1972

৪৫। Siddiq Salik : Witness to Surrender Dhaka- 1971 Dhaka- 1999

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার :

১। ডঃ এনামুল হক জাদুঘরের প্রাক্তন- মহা পরিচালক

২। ড. আফরোজ আকমাম - জাদুঘর কর্মকর্তা

৩। ড. রেজাউল করিম- জাদুঘরের কর্মকর্তা

৪। জনাব ইমামুর রশীদ- স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের কর্মকর্তা ছিলেন

৫। ড. ফিরোজ মাহমুদ- জাদুঘরের প্রাক্তন কর্মকর্তা

৬। তানভীর মাজহারুল ইসলাম- প্রাক্তন ক্রিকেটার

৭। সালাউদ্দিন- প্রাক্তন ফুটবলার

৮। আক্কু চৌধুরী - পরিচালক মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর

৯। শিল্পী প্রাণেশ কুমার মন্ডল

১০। জনাব এম এ হাই - প্রাক্তন পরিচালক বাটা সু কোম্পানী